উত্তরস্মৃতি

সম্পাদক
অরুণ ভট্টাচার্য

ছেয়ে"

ষ্টান্ন

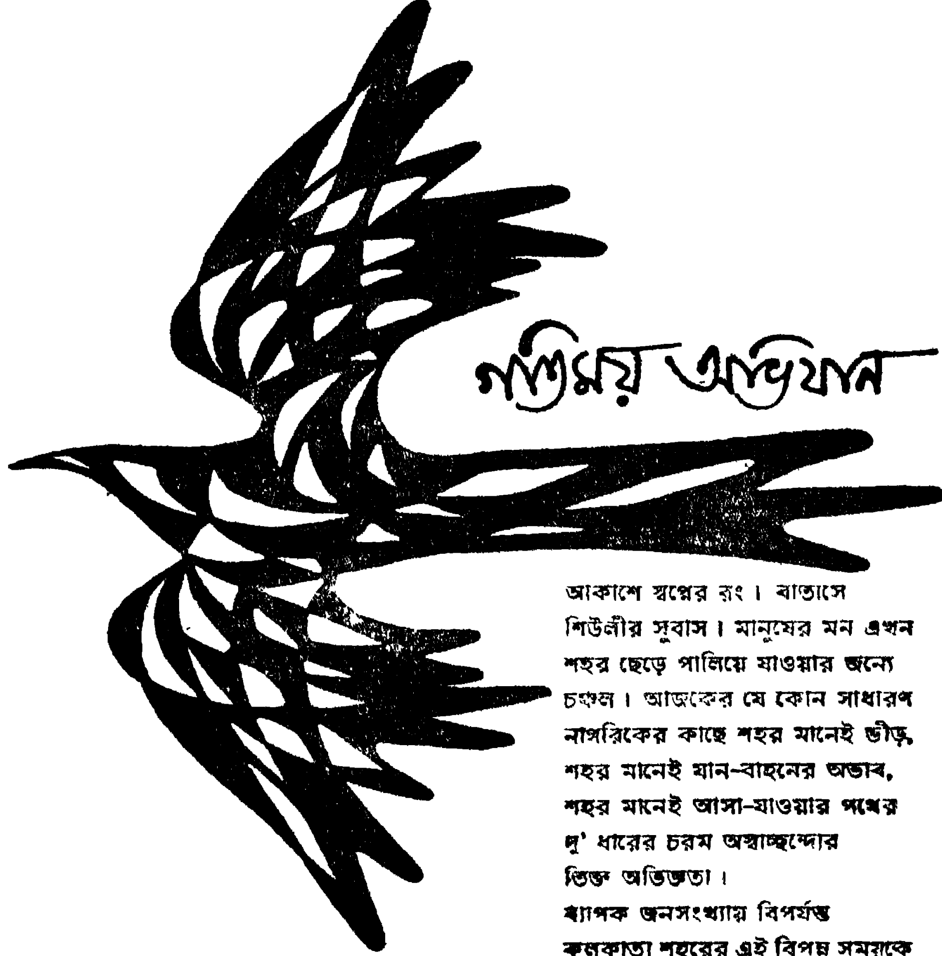
শরৎচন্দ্র : বিশেষ সংখ্যা : বিজ্ঞপ্তি

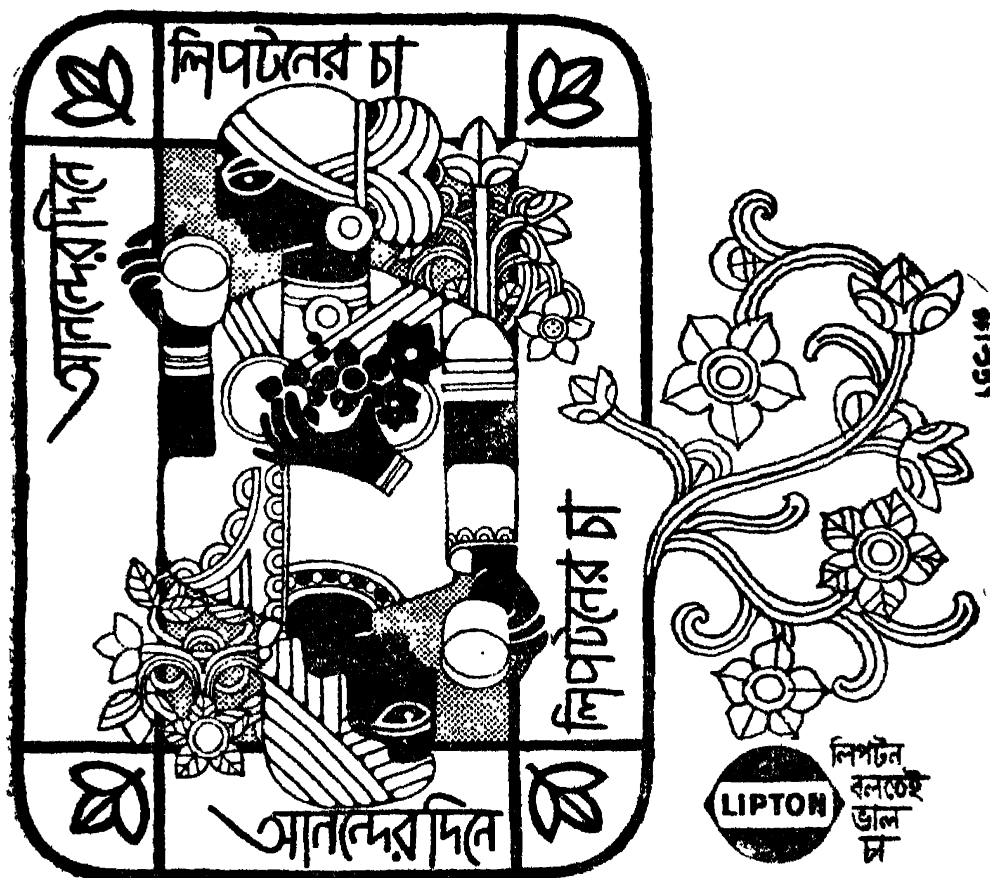
কয়েকবৎসর পূর্বেই শরৎচন্দ্র সম্পর্কে উত্তরস্মৃতি পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। বহু পাঠকের অনুরোধে তাঁর জন্ম-শতবর্ষে আমরা আবার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে উৎসুক। এই সংখ্যার একটি অভিনব পরিকল্পনা আছে। তাঁর অবিস্মরণীয় চরিত্র নিয়েই এই সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

১. শ্রীকান্ত ২. ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদি ৩. অচলা ৪. সাবিত্রী ৫. কমল ৬. রাম ৭. মহেশ ৮. দেবদাস ৯. ষোড়শী ১০. হেমনলিনী ১১. নতুন-দা ও বিলাসবিহারী ১২. বিপ্রদাস

এই রচনাগুলির লেখক নির্বাচন সম্পূর্ণ হয় নি। পনেরো থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে যাঁদের বয়েস,—নতুন যুগের প্রতিনিধিত্ব করবেন যাঁরা—তাঁদের কাছেও এবিষয়ে রচনা পাঠানোর সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য

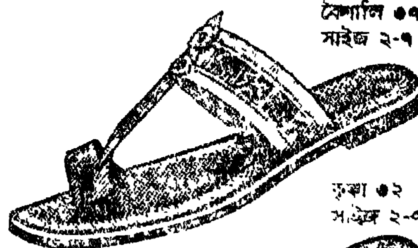

গতিময় অভিযান


লিপটনের চা
আনন্দের দিনে
লিপটনের চা
আনন্দের দিনে
LIPTON
লিপটন বললেই ভাল চা

পুজোয় চাই নতুন জুতো



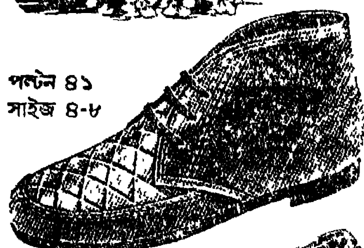
বৈশালি ৩৭
সাইজ ২-৭



কৃষ্ণা ৩২
সাইজ ২-৭



পল্টন ৪১
সাইজ ৪-৮



...পুরি ৫৪
সাইজ এস/এম/এল

ডিম্পল ৬৫
সাইজ ৯-১১
১২-১, ২-৬





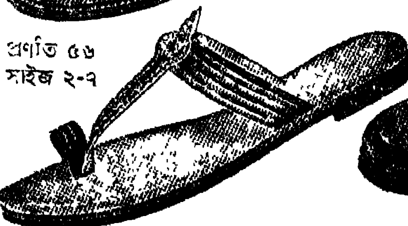
ওয়েফাইন্ডার্স ৫৩
সাইজ ৯-১১
১২-১, ২-৬

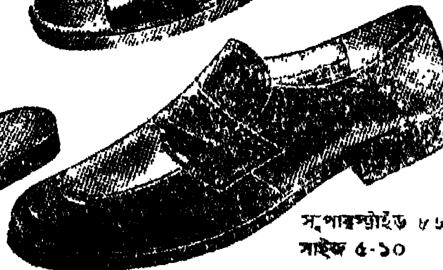




টাফলাইট ৬২
সাইজ ৫-১০

প্রণতি ৫৬
সাইজ ২-৭

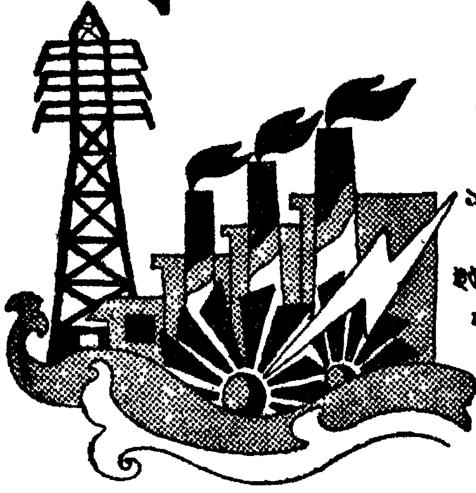




সুপারস্ট্রাইড ৮৬
সাইজ ৫-১০

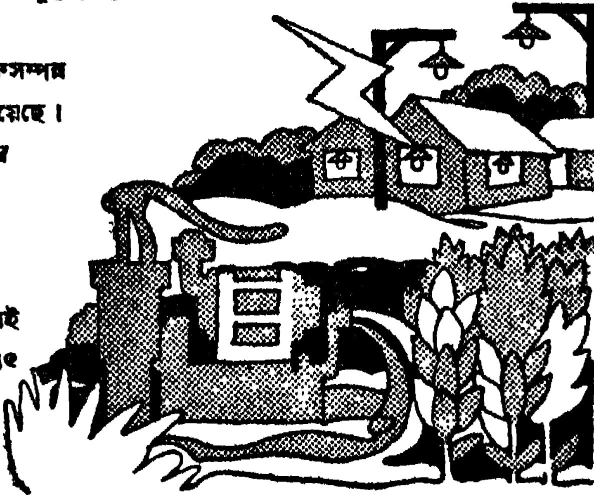
পরিবারের সকলের জন্য বাটার জুতো **Bata**

উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে...

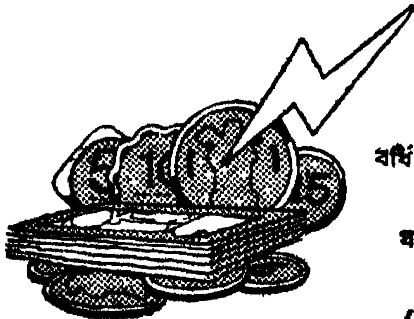


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ এই রাজ্যে কৃষি, শিল্প, রেলচলাচল, গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। এছাড়া, কলকাতার চাহিদা পূরণেও পর্ষৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে কলকাতার বিদ্যুৎ সংকটের মোকাবিলায় ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারটি ইউনিটকেই বছরের অর্ধেক সময় অবিরাম চালু রাখতে হয়েছিল। সাঁওতালডিহি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেও ইতিমধ্যে কলকাতায় বিদ্যুৎ সরাসরি আসছে ২২০ কেভি লাইনের মাধ্যমে। উত্তরবঙ্গে জলঢাকা কেন্দ্র নির্ভরযোগ্যভাবে বিদ্যুৎ যোগান দিয়ে চলেছে।

প্রকল্প : ব্যাণ্ডেল ও সাঁওতালডিহি—এ দুটি কেন্দ্র বর্তমানে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এছাড়া কোলাঘাটে তিনটি ২০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন ইউনিট স্থাপনের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। জলঢাকা ও কার্শিয়াঙের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর কাজও এগিয়ে চলেছে।



গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ : ইতিমধ্যেই রাজ্যের ১০,০০০টিরও বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যেই রাজ্যের ৭০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।



অর্থ : এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড়ের জন্যে পর্ষৎ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে জ্বালানী, মাশুল এবং অন্যান্য খাতে বর্ধিত ব্যয় সামাল দিতে বিদ্যুতের হার সংশোধন করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যদি ঠিকমতো অর্থ যথাসময়ে পাওয়া যায়, তাহলে ৫ম পরিকল্পনার শেষে রাজ্যে ১০০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলির কাজ সময়মতো শেষ করা সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ



ICP/WBSEB312/75



এখনো আটচালার ঘরে ঘরে, পল্লী বাংলার নিভৃত বটতলায়, বুড়ো শিবমন্দিরের চত্বরে বিকেল হলে বৃদ্ধ-যুবা যুবতীরা, ঘরের ঘরণী বৌ-ঝিরা গলায় আঁচল দিয়ে রামায়ণের কাহিনী শোনে।

মহালয়ার সকালে বোধন শোনে তারাই, বিসর্জনের ঢাকির বাজনা শুনলে শাড়ির আঁচল দিয়ে আঁখিপল্লব মোছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে আমরা নক্ষত্র-লোকের দিকে যাত্রা করেছি, তবুও শাশ্বত সনাতন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে আছি মমতায় ও স্নেহে।

ভীমচন্দ্র নাগ সেই প্রাচীন অথচ চিরনবীন ঐতিহ্যেরই ধারক। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন রুচিকে সে পরিপোষণ করে এসেছে। ঘরে ঘরে আজও তাই বাঁধা আছে তাঁর চিরস্থায়ী আসন ॥



ভীমচন্দ্র নাগ

কলিকাতা হাওড়া উত্তরপাড়া

উত্তরসূরী : বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮২ : ২২ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য ৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড কলিকাতা ৫০



শ্রীশ্রীদুর্গা

সুনীলমাধব সেন -অঙ্কিত

সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী ও কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র

অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে বর্তমান ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পী সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী ও আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র পরলোক গমন করলেন। শুধুমাত্র বাঙ্গালীর পক্ষেই এ বেদনা মর্মান্তিক নয়, সারা ভারতবর্ষের সঙ্গীত ও সাহিত্যজগতে এ ক্ষতি অপূরণীয়। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে এই দুজন খ্যাতকীর্তি শিল্পী তাঁদের স্ব-স্ব পরিধিতে দেশ ও জাতির সেবা করেছেন। কিন্তু অতীব ক্ষোভ ও লজ্জার কথা যে এ-দেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশের তথাকথিত মুরুব্বিরাই, তারাপদ চক্রবর্তীকে তাঁর ন্যায্য আসন পাবার পথে কণ্টকস্বরূপ হয়েছিলেন—সে দুর্ভাগ্য কিছুটা নরেন্দ্রনাথ মিত্রেরও।

আমার জানা নেই, ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ ও কেশরবাঈর পর ক'জন শিল্পী তারাপদবাবুর মত শিল্পকে সাধনার স্তরে নিয়ে গেছেন—ক'জন শিল্পী তাঁর মত শুদ্ধ কল্যাণ, পুরিয়া বা দরবারী কানাড়ার রূপায়ন করেছেন; আর এও জানা নেই বাংলা বা ভারতীয় সাহিত্যের কজন কথাসাহিত্যিক, রবীন্দ্রোত্তর যুগে, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচিত 'হলদে বাড়ি' বা 'অসমতল' এর অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির মত বা 'রস' নামধেয় অসামান্য সৃষ্টির মত সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। উত্তরসূরি পত্রিকায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র একদা গল্প লিখেছেন, তারাপদ চক্রবর্তী সঙ্গীত পরিষদ ও উত্তরসূরির সদস্যদের প্রাণ ভরে গান শুনিয়েছেন; এ সৌভাগ্যের জন্য আমরা আজও গর্ব অনুভব করি। এদের কারুকৃতির বিস্তৃত আলোচনা উত্তরসূরি-র পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। এঁদের অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।

অরুণ ভট্টাচার্য

জীবনানন্দের কবিতায় শব্দ-ব্যবহার

অরুণ ভট্টাচার্য

শব্দ কবিতার শুধু অবয়ব নয়, কবিতার প্রাণ। শব্দের অভিধানিক এবং ব্যবহারিক অর্থ ছাড়িয়েও যখন তা কোন দূরপ্রসারী ইঙ্গিত বহন করে তখনই কাব্যশরীর লাবণ্যময় হয়ে ওঠে। এই ইঙ্গিতকে সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তোলাই সৎকবির প্রধান দায়িত্ব। আমরা যখন 'জানালা' শব্দটি ব্যবহারিক অর্থে প্রয়োগ করি তখন তার বর্ণনামূলক ভাবটিই আমাদের মনকে আকর্ষণ করে, কিন্তু যখন কবিতায় 'জানালা' শব্দ সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয় তখন তা অনন্ত শক্তিশালিনী হয়ে ওঠে। আকাশ আমাদের কাছে চলে আসে মুহূর্তে।

> বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
> রূপসীর সাথে এক।

'সিন্ধুসারস' নামে কবিতাটির এই 'রূপসী' শুধুমাত্র রূপযৌবনা রমণীই নয়। এই রূপসী শব্দটি ব্যবহারের অলক্ষ্যে কবির এক সুদূরপ্রসারী ভাবনা কাজ করেছে—সেই ভাবনার ফসল হচ্ছে রূপসীর প্রতীক। সাধারণ অর্থ ছাড়িয়ে যখন শব্দ অসাধারণত্বে পৌঁছোয় তখনই শব্দের ব্যঞ্জনা লাভ করি। এই অর্থে কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে এখনো আদর্শ কবি। বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগে জীবনানন্দই শব্দকে নিয়ে খেলা-খেলা খেলেছেন, কিন্তু সেই খেলা-খেলা ছেলেমানুষী খেলা নয়।

'জীবনের গভীর গভীরতর অর্থ' যেখানে লুকোনো রয়েছে জীবনানন্দ সেই গভীর অর্থের অতলে ডুব দিয়ে ঝিনুক কুড়িয়েছেন। ঝিনুকের ভেতরে প্রাণস্পন্দন কানের কাছে নিয়ে শুনেছেন, অতঃপর শব্দগুলিকে ভালোবেসে

বসিয়েছেন একের পর এক। আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা সেন' থেকে এই আলোচনার সূত্রপাত করি।

রবীন্দ্রনাথের পর কবির কবি একমাত্র জীবনানন্দ। এবং যে কাব্যগ্রন্থে তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপ করা হয়ে থাকে তা হচ্ছে, আজকের কবিদের কাছে অতি-পরিচিত অতি-পুরাতন চটি কবিতার বই, 'বনলতা সেন'।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি অধ্যায় শেষ হবার পর অনেকেই আর আশা করেন নি, ষাটবছরের পরেও তিনি বাংলা কবিতার দিক পরিবর্তনে সচেষ্ট হবেন। বলাকার কবিতাগুলি প্রকাশিত হতে শুরু হলে বাংলাদেশের কবিদের চমক ভাঙ্গলো। তাঁদের মোহগ্রস্ততা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতেই সত্তর বছর পার করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার দিক পাল্টালেন। বলাকার মুক্তছন্দের পরিণতি হল লিপিকার গদ্যছন্দে। তৎকালীন আধুনিক কবিরা বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। তাঁরা যে দুর্মর চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্র-প্রভাব উত্তীর্ণ হবার, সেই রবীন্দ্রনাথই তাঁর নিজের কাব্যের গণ্ডির শৃঙ্খল ভাঙ্গলেন নিজে। পথ দেখালেন অনুজ-কবিদের। কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি প্রধান ঘটনা।

আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা হল 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশে। ছন্দের দিক থেকেও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি এক নূতন শৈলী স্থাপন করেছে। বলাকার মুক্তছন্দ ও লিপিকার গদ্যছন্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এবং মাঝে মধ্যে প্রবহমান পয়ারে একে যেন ঢেলে সাজিয়ে জীবনানন্দ কবিতাগুলিকে ভাবের দিক থেকে এক চিরন্তনতা এনে দিতে চেয়েছেন।

কিন্তু ছন্দের বিশিষ্টতার জন্য নয়, যে কাব্যলোকে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করেছেন তিনি, সেই জগৎই সকল পাঠককে মোহগ্রস্ত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের জগৎ থেকে সেই জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা—তার দৃশ্যাবলী, পথঘাট, তার আলো-অন্ধকার, নিবিড়তা, ধূসরতা, তার মানব মানবী গাছপালা— সব কিছু, সব রবীন্দ্র-কল্পিত জগৎ থেকে পৃথক। তাই জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম আধুনিক কবি। কোথায় তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ?

'খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মত ধান ভানে—
গান গায়—গান গায়
এই দুপুরের বাতাস।'

রবীন্দ্রনাথে কি এমন পংক্তি এমন সব শব্দ-ব্যবহার আশা করা গিয়েছিল কখনো! বর্ষীয়সী রূপসীর কথা হয়তো রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এমন শব্দ-যোজনা কি তিনি কোথাও করেছেন! এই ধান 'ভানা'র কথা, এমন একটি অতি-পরিচিত গ্রামীন দৃশ্যকে এমন অন্তরঙ্গ মমতার সঙ্গে—আর সে ছবির সঙ্গে মিলে আছে নির্জন দুপুরের বাতাসের একটানা অবিচ্ছিন্ন গান। চারিদিকে খররৌদ্র —সেই খররৌদ্র এনে দিয়েছে দুপুরের নিবিড় নির্জনতা। প্রথমেই মনে হবে এটি একটি অসাধারণ জীবন্ত ছবি। কিন্তু সেই ছবি, কিছু পরেই মনে হবে, একটি পুরো চিত্ররূপকল্পনা (জীবনানন্দের কবিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন চিত্ররূপময়)। এই রূপকল্পটি আমাদের মনের মধ্যে যে ঢেউ তোলে তা প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়-সঞ্জাত। এখানেই তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে স্পষ্ট দূরে সরে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে বা আরো বাড়িয়ে ধরলে, গীতাঞ্জলি অধ্যায়েরও বেশ কিছু পূর্বে, রবীন্দ্রকাব্যে ইন্দ্রিয়-সঞ্জাত অনুভাবনার কবিতা ছিল। এমন কি 'সোনার তরী'র কবিতাগুলিতেও এই স্পর্শ কিছু পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এই sensuousness কে বর্জন করেছেন— ইচ্ছাকৃত বলেই তো আমার মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা নিবেদন করি। কীটস্-এর কবিতার

sensuousness নিয়ে ইংরেজী সাহিত্যের পণ্ডিতরা বহু আলোচনা করেছেন। জীবনানন্দের কবিতার এই প্রসাদগুণটি কিন্তু কীটসের কবিতা থেকেও আবেদনে পৃথক। কেন পৃথক, তা একটি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবী রাখে।

'বনলতা সেন'—এই শব্দদুটিকে কেন্দ্র করে একদা বাংলা কাব্য-সমালোচনার আসরে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। এই ঝড় এখন থেমে গিয়েছে। এই কবিতাটি কিন্তু জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্তর্গত নয়, তথাপি এই কবিতাটি, তাঁর কাব্যরচনার ইতিহাসে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ছোট ১৮ পংক্তির কবিতাটি অপ্রত্যাশিত শব্দ যোজনায় এমন একটি আরো-অপ্রত্যাশিত, সম্পূর্ণ অপরিচিত অথচ কাঙ্ক্ষিত জগতের সন্ধান এনে দিয়েছে যে কাব্যপাঠক একে কোনদিনও ভুলতে পারবে না মনে হয়।

কবিতাটির শুরুতে তিনি এক অতিদূরবিস্তৃত প্রবহমানতার ইঙ্গিত দিয়েছেন (কিছু সমালোচক বৃথাই একে ইতিহাসচেতনা নাম দিয়েছেন—তাঁদের ধারণা, কবিতার সঙ্গে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ ইত্যাদি ব্যাপারগুলি জুড়তে পারলে বোধহয় কবিতা জাতে ওঠে) কিন্তু সেই বিস্তীর্ণতার মধ্যে হঠাৎ আচমকা নাটোর নামক ছোট্ট একটি মফঃস্বল সহরের আরো সামান্য একটি মেয়ে, যার নামই শুধু জানতে পারি—আর কিছুই জানিনে—কবিকে সেই নিদারুণ অস্তিত্বের ভার থেকে মুক্ত করে কাছে টেনে আনলেন। তার শান্তি তার বিশ্রাম তার প্রয়োজন সব পাওয়া গেল এই অ-সামান্য এক রমণীর কাছে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে নাটোরের বনলতা সেন চিরকালের একটি স্মৃতি হয়ে রইল কাব্যরসিকের কাছে।

পরের স্তবকে এই রমণীর বর্ণনা রয়েছে। এই বর্ণনা ব্যতিরেকেও কিন্তু তিনি আমাদের কাছে আকর্ষণীয় ছিলেন—বর্ণনার পর জানতে

পারলাম কবি কি করে তিলে তিলে তাকে সৃষ্টি করেছেন—শব্দকে নিজের করতলগত করে ব্যবহার করে অপরূপ জগৎ সৃষ্টি করেছেন :

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা ;
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ।

অপর্যাপ্ত ঘন চুল যে বিদিশা নগরীর রাত্রির কালো অন্ধকারকে ধরে রাখতে পারে, তার মুখে যে প্রাচীন শ্রাবস্তী নগরীর কারুকার্য আঁকা যায়—এমন কথা আগে আমরা কেউ ভাবিনি । কোন রমণীর এমন রূপ কি ইতিপূর্বে কেউ কল্পনা করেছেন ! জীবনানন্দ আমাদের সেই অপ্রত্যাশিত জগতের আরো এক অপ্রত্যাশিত রমণীর সন্ধান দিলেন। আমাদের চমক ভাঙলো। আজো সেই বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি বাংলা কাব্য-পাঠকের। আর তার চোখের বর্ণনা কেমন—পাখির নীড়ের মত—শুধু দৃশ্যমানতার মিল নয়। নীড়ে যে শান্তি পক্ষিণী জানে, সেই শান্তি ছড়ানো রয়েছে এই রমণীর চোখে, যে শান্তি তিনি কবিকে দিতে পেরেছিলেন। উপমাটি এজন্যেই এত সার্থক হয়েছে ।

কিন্তু কবিতাটি যদি এখানেই শেষ হতো তাহলে এর সৌন্দর্য মাত্র অর্ধেক উপভোগ করতাম। জীবনানন্দ আপাত বিষাদময় গোধূলির এক নিঃসঙ্গ জগতে আমাদের নিয়ে যেতে পেরেছেন ।

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী

এই home-coming মাত্র ছটি শব্দে বিবৃত হলেও, এর গভীরতা গ্রীক পুরাণের ঘটনাটির মতই দূরপ্রসারী। এখানে কবি একদিকে প্রবহমানতা অন্যদিকে চিরন্তন অথচ সহজ সত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু এই ঘটনাটি এখানে ঘটনাতেই পর্যবসিত হয়নি—এটি দ্বিতীয় একটি ঘটনার পটভূমি মাত্র। দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে বিস্তীর্ণ অন্ধকারে কবি ও সেই রমণী মুখোমুখি বসে আছেন, এই বসে থাকার দৃশ্যটিকেই তিনি চিরন্তন করতে চেয়েছেন ।

এটি কি প্রেমের কবিতা ! হয়তো। কিন্তু কোথাও এই রমণীকে

প্রিয়া কল্পনা করা হয়নি—কবির আচরণে তার বিন্দুমাত্র আভাষ নেই। অথচ এটি প্রেমের কবিতা। অর্থাৎ এই প্রেম নির্বিশেষ—রমণী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নয়, পারস্পরিক আকর্ষণ এই কবিতাকে রহস্যময় করে রেখেছে।

এবার শব্দের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করা যাক। দেখা যাবে, কোন শব্দই নূতন নয়। কোথাও কষ্টকল্পিত আভাষ নেই। অথচ জীবনানন্দ সম্পূর্ণ নূতন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন কী অসাধারণভাবে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

১. পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন (সুচেতনা)

২. মুনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল (কুড়ি বছর পরে)

৩. হয়তো এসেছে চাঁদ সারারাতে একরাশ পাতার পিছনে (ঐ)

৪. তখন হয়তো মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে—

... ...

সোনালি সোনালি চিল—শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে (ঐ)

৫. অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মত
ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা (হাওয়ার রাত)

৬. কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন (ঐ)

৭. মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায় (ঐ)

৮. আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো গেলাসে গেলাসে পান করি (ঘাস)

৯. ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে (ঘাস)

১০. হায় চিল, সোনালী ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে।
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে!
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে
আবার তাহারে কেন ডেকে আন? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা
জাগাতে ভালবাসে!
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকে ধানসিড়ি নদীটির পাশে।
(হায় চিল)

১১. খড়ির মতন সাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে (শঙ্খমালা)

১২. অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক; (নগ্ন নির্জন হাত)

১৩. অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো
একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য; (শিকার)

১৪. নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল।

১৫. হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরাণ রঙের সূর্যের নরম শরীরে
সাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে;
তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে
লুফে আনল সে
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল (বিড়াল)।

১৬. সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শূয়োরের
আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে। (অন্ধকার)

১৭. অকূল সুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তিকল্যাণ
হয়ে আছে। (শিরিষের ডালপালা)

১৮. উচ্ছল কলার ঝাড়ে উড়ে চুপে সন্ধ্যার বাতাসে
লক্ষ্মীপেঁচা হিজলের ফাঁক দিয়ে বাবলার আঁধার গলিতে নেমে আসে
(অঘ্রাণ প্রান্তরে)

১৯. ইঁট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব
চুপ হয়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে।
(পথ হাঁটা)

জীবনানন্দের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলানো যে কোনো কাব্যপাঠকের কাছে দুঃসাধ্য। আমি সেই সকল পংক্তি উদ্ধার করেছি যা আমার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবে। এর মধ্যে সব কটি উদ্ধৃতিই যে কবিতা হিসেবে উৎরেছে তা নয়, তবু রবীন্দ্রকাব্যের পরিধিকে ছাড়িয়ে জীবনানন্দের কাব্য যে স্বতন্ত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে তা প্রমাণ করবার জন্যই এই উদাহরণগুলি সন্নিবিষ্ট হোলো। ভালো কবিতা, সার্থক কবিতা, মহৎ কবিতা ইত্যাদি কবিতা-বিষয়ক ভালো-লাগা মন্দ-লাগার স্তর পেরিয়েও কবিতার একটা অনন্য স্বাদ পাঠকচিত্তে পৃথকভাবে দানা বেঁধে ওঠে। জীবনানন্দের কবিতাগুলি, বিশেষ করে 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি, সেই স্বাদ এনে দেয় পাঠকচিত্তে। এই সকল কবিতাগুলি, যার অংশত উদ্ধৃতি দেওয়া হল, একবার দুবার নিবিষ্ট মনে পড়ে গেলেই পাঠক বুঝতে পারবেন, তাঁর সব কটি ইন্দ্রিয় দিয়ে এই কবিতাগুলিকে অনুভব করবার। বনলতা সেন—এই নাম কবিতাটিই তো এর প্রাথমিক উদাহরণ। কবিতাটি স্বগতোক্তির মতো মনে পড়ে গেলে এক অনতিউচ্চারিত জগৎ ধীরে ধীরে কাছে চলে আসে—যে জগৎ স্পর্শকাতরতায় পাঠককে কাছে টানে। এই সকল পংক্তির ধ্বনি সংযোজনা

আমাদের সুখশ্রাব্যতাকে পূর্ণ করে দেয়—'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে' অথবা 'চুল তার কবোর অন্ধককার বিদিশার নিশা'—এই ধ্বনিমণ্ডল যেন পাঠককে গ্রাস করে নেয়।

এমনি সব ধ্বনিগ্রাহ্যতা রয়েছে ২, ৭, ৮ (নানাবিধ কারণে 'হায় চিল কবিতাটির পূর্ণ উদ্ধৃতি দেওয়া হল) ৯ চিহ্নিত পংক্তিগুলিতে। যেখানে জীবনানন্দ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে চেয়েছেন সে সব পংক্তিতে তিনি রোমান্টিক কবিদের সহমর্মী। ৯ নং চিহ্নিত পংক্তিতে এমন আভাস মিলবে। জীবনানন্দের কাব্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় পংক্তিগুলি আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। যে অসাধারণ দৃশ্যময়তা তাঁর কাব্যের সংসারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার তুলনা বোধহয় রবীন্দ্রনাথেও বিরল। উদ্ধৃত ১৯টি স্তবকের মধ্যে বেশীর ভাগ স্তবকেই এই দৃশ্যময়তার এক নিমগ্ন সৌন্দর্য কাব্যপাঠককে বিহ্বল করে।

আর যে সমস্ত পংক্তি আমাদের চৈতন্যের গভীরে নাড়া দেয়, যার দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে আমি এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর মুক্ত হতে পারি নি, তা বাংলা সাহিত্য নয়, বিশ্বের কাব্যসাহিত্যের উজ্জ্বল উদাহরণ। এই সমস্ত পংক্তি সহৃদয় পাঠক সারা বইটিতে ছড়ানো দেখতে পাবেন।

বিশেষণের ব্যবহার জীবনানন্দের কাব্যে এক অসাধারণত্ব এনে দিয়েছে। 'বিস্তীর্ণ উল্লাস' বা সূর্যের 'নরম শরীর' 'ভিজে মেঘের দুপুরে' এই সব বিশেষণ কী যে অলংকার-সদৃশ তা বর্ণনা করা সমালোচকের দুঃসাধ্য। 'হায় চিল' কবিতাটি সম্পূর্ণই তুলে দিয়েছি। 'বনলতা সেন' কবিতাটির থেকেও এই কবিতাটি আমাকে বেশী টানে। একদিকে কবিতাটি আমার আত্মার আত্মীয়, অন্যদিকে এই কবিতাটি আমার শারীর অস্তিত্বের সবকটি জানালাকে আকাশের নীলে উন্মুক্ত করে দেয়। এর বিশদ ব্যাখ্যা করতে গেলে আমার অক্ষমতা হয়ত কবিতার সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করতে পারে বলে মনে হয়। শুধু এইটুকু বলে শেষ করি যে,

'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মত সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে' এমন পংক্তি একমাত্র জীবনানন্দের পক্ষেই রচনা করা সম্ভব ছিল। একটিমাত্র পংক্তিতে তিনি যে রহস্যময় অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান দিয়েছেন তা যেন জাদুকরের অমোঘ মন্ত্রের মত। 'রাঙা' 'রাজকন্যা' পরপর এমন দুটি শব্দ-যোজনা আর কোথাও পেয়েছি কি? এমন মন্ত্রধ্বনি? এই মন্ত্রধ্বনি ইদানীং আর তো শুনতে পাইনে।

নিশিকান্ত প্রসঙ্গ

হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিদিনের রূঢ়তা ও কর্কশ কোলাহলের মধ্যে যে মানুষটিকে স্মরণ করে স্নিগ্ধ হই, ফিরে পাই হারানো বিশ্বাস, তর্প-নীয়-তে তাঁর আগমন অনিবার্য। কবিসাধক নিশিকান্তর কথাই বলছি।

চারবছর বয়স থেকে চব্বিশ বছর পর্যন্ত নিশিকান্ত রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের বটচ্ছায়ায় লালিত পালিত। রবীন্দ্রনাথ বালক নিশিকান্তর কবিতার মৌলিকতা দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ছবি দেখে তাঁকে বলেছিলেন: 'নন্দলাল আমার ছেলে, আর তুই আমার নাতি।' এবং নিশিকান্ত যখন শান্তিনিকেতন ছেড়ে পণ্ডিচেরী চলে গেলেন তখন অবনীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের একজনকে দুঃখ করে বলেছিলেন: 'আমাদের কাছে যে দুচারজন জাত আর্টিষ্ট এলো, তাদের মধ্যে একটিকে তোমরা নিয়ে নিলে।' শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসবার আগে নিশিকান্ত তাঁর ছবিগুলি স্তূপাকার করে আগুন ধরিয়ে দেন। এক বন্ধু ঝাঁপিয়ে পড়ে কিছু উদ্ধার করে রাখেন। অনেকগুলি ছাই হয়ে যায়। কিন্তু এখনও যত ছবি আছে তার সংখ্যা খুব কম নয়। সেগুলি প্রচারিত হলে শিল্পী নিশিকান্তর জন্যে অবনীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসের কারণ অনুভব করা যায়।

নিশিকান্তর মুখে শুনেছিলুম 'দ্বাদশ সূর্য' নাম দিয়ে তিনি একখানি ছবি এঁকেছিলেন। উদয় দিগন্তে আরক্ত সূর্য। ঘোর কালো মেঘেরা দল বেঁধে সূর্যকে গ্রাস করবার জন্যে তার মুখের কাছে এসেছে। কোনো মেঘ হাতীর শুঁড়ের মতো, কোনোটা হাঙরের আকৃতি, কোনোটা অজগরের মতো। সেই কালো কালো মেঘগুলো সূর্যকে গ্রাস করবার

জন্তে যেই তার মুখের কাছে এসেছে অমনি তাদের ঘোর কালো দেহ সূর্যের স্পর্শে সোনা হয়ে গেলো। রূপান্তর।

পণ্ডিচেরীতে যখন চিত্রকর কবি নিশিকান্তর সঙ্গে আমার দেখা হয় তার কিছুকাল আগেই তিনি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন। তখন কবিতায় তিনি তাঁর সমস্ত মনটিকে একাগ্র করেছেন। খাতার পর খাতা ভরিয়ে ফেলেছেন কবিতায়। তুলির রেখায় নয়, বচন দিয়ে অনির্বচনীয়কে ধরবার সাধনায় তিনি তখন তন্ময়।

শ্রীঅরবিন্দ-শ্রীমা চেয়েছিলেন শিল্পে নিশিকান্ত পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠুন। কারণ শিল্পী নিশিকান্তর মধ্যে সেই মহৎ সম্ভাবনা তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর ছবির মধ্যে। তাই শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দ নিশিকান্তর শিল্পী মনকে সঞ্জীবিত করবার মহৎ উদ্দেশ্যে তাঁকে উটাকামণ্ডে পাঠান। নিশিকান্ত উটিতে বসে অনেকগুলি ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকেন। সেই মনোহরণ চিত্রগুলি ডাইনিং রুমে নৈসর্গিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে বিরাজ করত। পণ্ডিচেরীতে যাবার পর শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমার উৎসাহে নিশিকান্তর কাব্য ও চিত্র সাধনা সমানভাবে চলে। মনে হয় 'অলকানন্দা'র এই কবিতাটি সেই সময় লেখা :

মোর উপলব্ধির পরশমণির
যা কিছু পাই,
সঙ্গীতে আর রেখাভঙ্গীতে
ফুটাই তাই।
বহুরে বিকশি বিচিত্রতায়
কত লীলা দোলে মোর সত্তায়
রূপের নিখিল বাণীর জগৎ
মিতালি করে,
রঞ্জিত রাগে জাগে চিত্রালী
গীতালি ঝরে।

শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমার আগ্রহে পণ্ডিচেরী যাবার পর নিশিকান্ত কিছুদিন মাত্র চিত্রসাধনা করেছিলেন—তারপর বন্ধ হয়ে যায় তাঁর ছবি আঁকা। সে প্রেরণা আর ফিরে আসে নি। তাই নিশিকান্তর শিল্প প্রতিভারও বড়ো বিকাশ হলো না। তবু নিশিকান্ত চিত্রে তাঁর প্রতিভার যে রশ্মিচ্ছটা ফুটিয়ে গেছেন, অ্যালবাম করে সেগুলি প্রকাশিত হলে তাঁর ছবিগুলি শিল্পরসিক সমাজে পৌছুতে পারে এবং শিল্প-সমালোচকরা তার মূল্যায়ন করতে পারেন। মনে আছে, আমি মাঝে মাঝেই তাঁর ছবি আঁকা ছাড়ার জন্যে আক্ষেপ করতুম। তিনি চুপ করে শুনতেন। একদিন বলেছিলেন, 'যদি আঁকি প্রথম ছবিটা তোমায় দেব।' সে ছবি আর আমার ভাগ্যে জোটে নি। একদিন তাঁর ছবি আঁকা ছাড়ার জন্যে আক্ষেপ করেছি, কিন্তু আজ আর সে খেদ নেই। আজ বুঝেছি, শিল্পী নিশিকান্ত ফুরিয়ে গিয়েছিলেন। তাই সে প্রেরণাও হয়েছিলো অন্তর্হিত। সৃষ্টির প্রেরণা থাকলে শিল্পী কখনো থেমে যেতেন না। আন্তর-প্রবেগে শিল্প-সৃজনে বাধ্য হতেন তিনি। কবির পাশে চিত্রকরও সক্রিয়ভাবে দীপ্ত থাকতেন।

শান্তিনিকেতনে নিশিকান্তর কবিতার কী গুণ দেখে রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার কিছু বোঝা যায় তিনযুগ আগে নিশিকান্তর খণ্ড কবিতার যে ডালাটি 'টুকরি' নামে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয় তা পাঠ করলে। কিন্তু শান্তিনিকেতনে লেখা নিশিকান্তর সেই খণ্ড কবিতাগুলি আজও অপ্রকাশিত। আমার সৌভাগ্য 'টুকরি' ছাড়া আমি সেই প্রকাশ না করা কবিতার অনেকগুলিই শুনি কবির ছোট বোন অপর্ণাদির কাছে। তিনি খাতা থেকে পড়ে শুনিয়েছিলেন এবং যেগুলি লেখা ছিলোনা সেগুলিও শুনিয়েছিলেন তাঁর স্মৃতি থেকে। মনে আছে শান্তিনিকেতনে লেখা সেই কবিতাগুলি পড়ে আমি একথা মনে না করেই পারিনি, আধুনিককালের কাব্য পাঠকের কাছে সেই শান্তিনিকেতন অধ্যায়ের কবিতাগুলি পরবর্তী কালের কাব্যের চেয়ে কোনো কোনো লক্ষণের জন্যে বেশী মূল্য পাবে।

নিশিকান্তর খাতায় পড়া সেই অবহেলিত কবিতাবলী আমাকে মুগ্ধ করে। তরুণ কবির মৌলিকতায় জাগে বিস্ময়। আজ সামনে 'টুকরি' খুলে বসে, কবিগৃহের নিরালায় পড়া সেই অনাদৃত কবিতাবলীর কথা স্মরণ-পথে অনুভব করে, এমন কথা মনে অসঙ্গত ঠেকেনা। তিরিশ দশকের সুরু থেকে বাঙলা কাব্যের যে বিবর্তলীলার প্রকাশ তার প্রথম বংশীধর নিশিকান্ত। রবীন্দ্রনাথ নন। শান্তিনিকেতনে লেখা নিশিকান্তর সেই প্রকাশ-না-করা কবিতাগুলিকে সেই যুগের রবীন্দ্রকাব্যের পটভূমিতে দেখলে এ-কথার বিচারটা ন্যায়সঙ্গত হবে। এবং সমগ্রভাবে কবি নিশিকান্তর প্রথম অধ্যায়ের সেই কবিতাবলী পড়ে এ-কথা মনে না হয়েই পারেনি, এ কবি মৌলিক প্রতিভার অধিকারী। রবীন্দ্রনাথের মর্মরিত আলোছায়া খেলা আঙিনায় লালিত পালিত হয়েও তিনি বর্দ্ধিত হয়েছেন আপন রূপ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। সেই কবিতা রবীন্দ্রকাব্যের চেয়ে সুস্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র। এ-কথা কবিকে জানিয়েছিলুম। মনে আছে একদিন তিনি তাঁর কাব্যপ্রসঙ্গে সকৌতুকে একটা গল্প বলেন। রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত তাঁর কিছু কবিতা পাঠ করে অবনীন্দ্রনাথ বলেন 'তোর এ কবিতাগুলোয় যে বুড়োরই দাড়ি চোখ কপাল উঁকি মারছে রে। তোর সেই হাঁদা হাঁদা খাঁদা খাঁদা মুখটা তো দেখতে পেলুম না।' রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত কবি নিশিকান্তর সেই মুখটাই অবিকল রেখেছিলেন। তাই সেই শান্তিনিকেতনের কবির মুখ ও মুখশ্রী দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের।

সেই খাতা, অযোগ্য বলে প্রকাশ-না-করা সেই কবিতাগুলি, আমার কাছে নেই। কিন্তু 'টুকরি'র এক মুঠো কবিতা চোখের সামনে আছে। মনে করা যায় না এগুলিই কবির সেই অধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ ফসল। তবু হাতের কাছের 'টুকরি' থেকে দু'চারটি তুলে দিচ্ছি। হয়তো এগুলি পড়েই পাঠক অনুভব করতে পারবেন, কবির জীবনাবেগ কতখানি জীবন-প্রীতির দ্বারাই পরিপুষ্ট, বাস্তববোধ প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গম্য, জীবনের

চলচ্চিত্র জীবনেরই রঙে রূপময় চিত্রময় : আলো-ছায়াময় : কবির কলমের টানে চলমান স্থিরচিত্রে যেন শাশ্বতীর ঝলকে ঝলকিত :

আষাঢ় চলেছে আঁধার আকাশে
মেঘের ঝুলিটা নিয়ে
বর্ষণ তার পাড়ায় পাড়ায় দিতে।
ঝুলি নিয়ে কাঁধে ঘুন্টি বাজিয়ে
নির্জন পথে ছোটে
পোষ্টাপিসের পরাণকেষ্ট রানার।

লৌকিকতার আটপৌরে ছবিতেই অলৌকিক হয়ে উঠেছে। বৃষ্টিঝরা মেঘকালো পথ পথিকহীন! সেই নির্জন পথে কাঁধে ঝুলি নিয়ে ঘুন্টি বাজিয়ে একা চলেছে রানার—তার কর্তব্য-কর্ম পেটের দায়ে বজায় রাখতে।

নিশিকান্তর শান্তিনিকেতনের অধ্যায়ের কাব্যে মানুষের জৈববৃত্তির, সুখদুঃখানুভূতির অনবদ্য চিত্র ফুটেছে। চোখ দিয়ে দেখি কবির আঁকা ছবি। হৃদয় দিয়ে অনুভব করি কবির দরদ।

জীবনের কবি নিশিকান্ত। জীবন থেকেই তাঁর কাব্য প্রাণিত। জৈবলীলা কবিকে চিত্রকর করেছে। জীব-প্রকৃতি ভূ-প্রকৃতি দুইতেই নিশিকান্ত বিমুগ্ধ। হাঁদা হাঁদা থাঁদা থাঁদা মুখে অবাক হয়ে দেখেছেন জীবন চিত্র। তার পাশে ভূ-চিত্র এঁকেছেন চিত্রকরের তূলিতে। ধরেছেন তিন-রঙা ছবি :

যতদূর চাই
সরল সবুজ মাঠ
তারই মাঝে চরে
অলস পাটল গরু
দাঁড়কাক তার পিঠে বসে আছে চিকণ কালো।

রঙের বৈচিত্র্য, সামঞ্জস্য অসামঞ্জস্যের বিরোধ-মিলন কটা সাদা কথায় বিচিত্র ছবি হয়ে ফুটেছে।

আর একটি ছবি :

রাঙা পথখানি ফ্যাকাশে হয়েছে চাঁদের আলোয়
ধূ ধূ করে খোলা মাঠ
একা তালগাছ শূন্যে তাকায়ে রয়।

কিন্তু কবি দরদী। পাঠককে চাঁদের আলোয় ফ্যাকাশে, লালমাটির রাস্তায়, ধূ ধূ মাঠে, সঙ্গহীন তালগাছের শূন্যতায় রেখে পালাতে চাননি। রসিক কবি তারপরই হঠাৎ লোকালয়ের একটি জানালা খুলে দেখিয়ে দেন সেখানে মধুরং মধুরং মিলনাবেগের মুখর ছবিখানিও :

থেকে থেকে আজ দমকা হাওয়ায়
আঁচলে পাঞ্জাবীতে
বাধায় হুলুস্থুল।

চল্লিশ বছর আগের লেখা আর একটি ছবি : লোকালয়ের কোনো গৃহের। অনবদ্য :

তখনও অন্ধকার
কিসের শব্দ ?
বাগানে ঢুকেছে গরু ?
নয়তো বাদুড় এসেছে আমের লোভে।

পাঠকচিত্তে এই নিতান্তই স্বাভাবিক প্রত্যাশাটি জাগিয়ে কবি তাঁর :

টর্চের আলো জালিয়ে দেখি ;
জামরুল গাছে একটা ছেলে
তলার মেয়েটি দাঁড়িয়ে আঁচল পেতে।

অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিস্ময় চিত্রকর-কবির তুলিতে ছবির বিস্ময় নিয়ে ফুটে উঠেছে।

আর 'টুকরির' এই টুকরোটা পড়লে কি মনে হয় না, এ যেন নিশিকান্তের হালেরই হলকর্ষণ ?

ছয় মাস আগে কলেজ ছেড়েছ ?

শেলী পড়েছো তো, কবি ব্রাউনিং ?
ঘরের কোণের হারমোনিয়ামটা তোমার বুঝি ?
বাজাতে জানো তো ?
গাও তো একটা নজরুল ইসলাম।

চল্লিশ বছর আগের পুরনো কবিকে নয়, আমরা দেখি যেন সাম্প্রতিক কালের কবিকেই। এইখানেই তাঁর সেই অধ্যায়ের কাব্যের মৌলিকতা, তাঁর বিস্ময়।

একদিন শান্তিনিকেতনের কবি নিশিকান্ত তাঁর সেই অধ্যায়টি শেষ করেছিলেন 'আমার কথাটি ফুরালো' বলে :

আমার কথা ফুরায়, তবু
আবার কথা জমে।
নূতন নটে গজিয়ে ওঠে
নূতন শাকের ক্ষেতে,
গরু চরে মুড়িয়ে দেয়
ভাত দিতে বৌ ভোলে,
কেন ভোলে সেই কথাটি
বলা রইল বাকি।

যে কথাটি ছিলো অনুক্ত, সেই উক্তিটিই কি করেছেন পরবর্তী অধ্যায়ে পণ্ডিচেরীর কবি নিশিকান্ত? আজ নিশিকান্তর ঐ দুটি পর্যায়ের কাব্যকে দেখলে দেখা যাবে দুয়ের মৌল প্রেরণা ও কবি-কর্মের প্রভেদ।

শান্তিনিকেতনের কবি জগৎমুখী। অসাধারণ মানুষের নয়, নিতান্তই সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কথা, সহজিয়া ছন্দে ও কথ্য ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সেই অধ্যায়ের কাব্যে পাই ব্যক্তি মানুষের ও জীবনের রূপবৈচিত্র্য ও হৃদস্পন্দন। শান্তিনিকেতনের কবির কাব্য লৌকিক হয়েই সার্বজনীন মানবচিত্তের ছোঁয়া দিয়ে যায় আমাদের চিত্তে। সেখানে সকলের রসের মুক্তি। জীবন-বিমুগ্ধ কবি আত্মস্থ।

পণ্ডিচেরীর কবির প্রেরণা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। তিনি আর জগৎমুখী ও ব্যক্তিমুখী হতে চাননি তাঁর অভীপ্স ঈশ্বরমুখীনতা। গুরুর বয়ানে দেখেন সেই সাইলেন্সকে—সেই নৈঃশব্দ্যকে। পণ্ডিচেরীর নিশিকান্ত হতে চেয়েছেন আত্ম-সমর্পণের কবি....'তোমার গভীর অতলতার কোলে···আমার সকল সত্তা সমর্পিলাম!' কবি তাঁর ভক্তিভাবের কেন্দ্রটির বিকেন্দ্রীকরণ করে জীবনকে দেখেছেন। রঙের বৈচিত্র্যে, উপমায়, চিত্রকল্পে নানা স্বর সেধে তিনি ধ্যান করতে চেয়েছেন, চেয়েছেন লাভ করতে সেই নিরঞ্জনকে—বহুর মধ্যে সেই এককে। কাব্য আর তাঁর কাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়—উপায় মাত্র। লক্ষ্য সেই ফেস-অফ-সাইলেন্স এর সাযুজ্য সামীপ্য সালোক্য। শান্তিনিকেতনের কবির কাব্যের মতো এ কাব্য সর্বমানব-চিত্তের দৃষ্টিগোচর নয়। শান্তিনিকেতন থেকে পণ্ডিচেরী এসে কবি মিষ্টিক হয়ে গেছেন।

এই পরিবর্তনে ভাষাও বদলে গেছে। দুই পর্যায়ের কবিতায় ভাষার নির্মিতির প্রভেদ বস্তুর মতো স্পষ্ট। এবং মিষ্টিক রস সর্বজনভোগ্য নয় যদিও, তবু পণ্ডিচেরীর কবির কাব্য তার বাচনিক গুণে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। জগৎমুখী ও ঈশ্বরমুখী দুই কবির কাব্যই সার্থক হয়ে ওঠে, শব্দে উপমায়, আন্তর আবেগে, ছন্দধ্বনির বিচিত্র সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে। আধ্যাত্মিক কবিতা মিষ্টিসিজমের দুরূহতার অভিযোগ মাথায় নিয়ে কাব্যের গৌরীশৃঙ্গের ধবল শিরে ঝলমল করে উঠতে পারে। তার নিদর্শন শ্রীঅরবিন্দ। যেখানে হিমালয় চূড়ায় শেক্সপীয়র বসে আছেন, রাজসিংহাসনে সম্রাটের মতো। মিষ্টিক কবিতার বিবর্তলীলাই স্পিরিচুয়াল কবিতা। কলিযুগে শ্রীঅরবিন্দই সেই কবিতার, উত্তরকালের কাব্যের বংশীধর-পিনাকধর। মিষ্টিক কবির বাণীর সেই কোষাগার লাভ হয়না পূর্ণ অভিজ্ঞানের অভাবে, উপলব্ধির আংশিকতায়। উপলব্ধি ও অনন্ত বাকসৃষ্টির দ্বারাই শ্রীঅরবিন্দের স্পিরিচুয়াল মহাকাব্য সিংহাসন লাভ করেছে শীর্ষের ধবল চূড়ায়। সাবিত্রীর ঐ অলোকসামান্য বাকপ্রতিভার

দিকে চেয়ে প্রগাঢ় আনন্দ বিস্ময়ে, আর প্রত্যয়ের ভিন্নতার কথা মনেই ঠাঁই পায় না। কবির প্রত্যয়ের সঙ্গে ভেদানুভব কাব্যের নীচের ধাপে। এবং এই ক্ষেত্রেই এলিয়টেরও কথা সত্য যে, যে কবির সঙ্গে আমাদের প্রত্যয়ের মিল যতখানি গভীর হয়, সে কবির কাব্য আমরা এতবেশি উপভোগ করি। তাই মিষ্টিক কবি নিশিকান্তর কাব্যও পাঠকের প্রত্যয় অনুযায়ী উপভোগে ঘটাতে পারে তারতম্য। কাব্য সমালোচক মহাজনদের সমালোচনার দিকে একটুখানি দৃষ্টিপাত করে এ-কথা ভাবতে অসঙ্গত লাগেনা, যে কাব্য বিচারে উচ্চ মণীষার এতো বিচার বিশ্লেষণ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমালোচক বা রসিকের ব্যক্তিগত মেজাজ বা প্রবণতা বা কাব্যসংস্কারই জয়যুক্ত হয়। তখন কাব্যের নিরিখে সেই উপলব্ধিকে তাঁরা চান প্রতিষ্ঠিত করতে।

আজ শান্তিনিকেতনের কবি নিশিকান্ত বিলুপ্ত। 'টুকরি'র কয়েকজন কাব্যরসিকদের কাছে হয়তো সেই কবি বেঁচে আছেন স্মৃতির মিউজিয়ামে। পণ্ডিচেরীর কবিরূপেই পরিচিত নিশিকান্ত। জীবনবাদী আধুনিক কবিদের দেখেছি তাঁর কবিতা উপভোগ করতে। এক প্রখ্যাত আধুনিক কবি ও গল্প লেখক আমাদের কাছে বলেছিলেন, 'নিশিকান্তর কবিতা যেন ভেতর থেকে উথলে উঠেছে।' নিশিকান্তর কবিতা পড়ে বলিষ্ঠ ভোগবাদী কবি মণীষী সমালোচক মোহিতলালের যে প্রতিক্রিয়া তা খুব চিত্তাকর্ষক। কি করে হয়েছিলো জানা নেই, মোহিতলালের মধ্যে নিশিকান্তর কবিতা সম্পর্কে একটা অনুচ্চ স্বীকৃতি অতি স্বল্প মন্তব্যের মধ্যে দেখেছিলুম। এবং সেই ভরসায় যখন নিশিকান্তর কবিতার খাতা ও প্রকাশিত কবিতা তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম তিনি কিছু পড়ে পণ্ডিচেরীর কবির প্রতি বিমুখ হলেন। কিন্তু যখন মাঝে মাঝে তাঁকে নিশিকান্তর এমনিধারা কবিতার দুচারটি চরণ আবৃত্তি করে শোনানো হতো, 'পাগলা হাতির পা ভেঙে দি, বাঘের বুকে বর্শা বেঁধাই। হায়রে তবু হরিণ শিশুর নয়ন দেখে পথ ভুলে যাই।' তখন মোহিতলাল বলে

উঠতেন Wonderful! He is a true poet. মনে আছে বাগনানে তাঁর হ্রদের ধারে বারান্দায় এক রোদ ঝলমল সকালে তাঁকে অনেকগুলি কবিতা পড়ে শোনাই নিশিকান্তর 'অলকানন্দা' থেকে। 'নিস্তব্ধ বয়ান' শুনে তিনি কবিতাটির খুব প্রশংসা করেছিলেন। ঐ কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন: নিশিকান্ত এই কবিতায় শ্রীঅরবিন্দের মুখই এঁকেছেন। কিন্তু পাঠকরা কি দেখবেন? যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত তাঁরা কবির মতো অরবিন্দেরই মুখ দেখবেন। যাঁরা বুদ্ধের বা খৃষ্টের শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত তাঁরা নিজের নিজের ইষ্টদেবতার মুখই দেখতে পাবেন এই কবিতায়। এইখানেই কবিতা বিশেষ থেকে নির্বিশেষ হয়ে সার্থক হয়। কিন্তু বিশেষ রূপটি নিখুঁতভাবে ফোটাতে হবে। না হলে কাব্য ব্যর্থ। Truely personal হলে তবেই কবিতা impersonal হতে পারে। 'মহামায়া' কবিতাটি ভালো লেগেছিলো। কবিতাটি শোনার পর প্রশংসা করে বইটি আমার হাত থেকে নিয়ে 'মহামায়া' নামটির পাশে লেখেন, Burden of mystery. সাহস পেয়ে তাঁকে নিশিকান্ত সম্পর্কে কিছু লিখতে বলায় তিনি বললেন এবং পরেও বলেছিলেন: 'তুমি মাঝে মাঝে নিশিকান্তর যে কোটেশনগুলো শোনাও, সেগুলো আমায় লিখে দিও। আমি নিশিকান্ত সম্বন্ধে লিখব।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার লিখে দেওয়া আর হয়নি। নিশিকান্তর প্রতি আমার এই কর্তব্য না করার জন্যে দুঃখ বোধ করেছি। বাংলার এক শ্রেষ্ঠ মণীষী সমালোচকের মূল্যায়নের সুযোগ পেয়েও হারাল নিশিকান্তর কাব্য। বারবারই এ কথা আমার মনে হয়েছে, আজও নিশিকান্তর কবিতার মূল্যায়ন হয়নি তেমন করে। তাঁর কবিতা নিয়ে শ্রীঅরবিন্দর ভক্তদের যে প্রশস্তি চোখে পড়ে তার অধিকাংশই ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র। কদাচ মূল্যায়ন নয়। কারণ অধিকাংশই নিশিকান্তর কবিতার কাব্যমূল্য সম্পর্কে ঘোর উদাসীন। কেননা তাঁরা কাব্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। যাঁরা কাব্যরসিক তাঁরা কাব্যের মূল্যায়নে প্রবৃত্ত না হয়ে ভক্তিভাবের আশ্রয় নিয়ে নিশিকান্তর

কবিতার প্রশস্তি করেন।

নিশিকান্তর পণ্ডিচেরী অধ্যায়ের কাব্যের মূল্যায়ন মনস্বী সমালোচকরাই করবেন। আমি সমালোচক নই। নিশিকান্তর কাব্যের অনুরাগী পাঠক। বহুকাল থেকেই তাঁর কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করে আসছি। তার ফলে মোটামুটি একটা অনুভব হয়ে থাকবে। আমার কথা বিচার থেকে নয়—অনুভব থেকে। নিশিকান্তর কাব্য সম্পর্কে প্রথমেই যে কথা মনে হয়েছে তা এই, রবীন্দ্রনাথের পাশে থেকে তাঁরই কাব্য ও স্নেহের যুগ্ম ধারায় পুষ্ট হয়ে যে নিশিকান্ত কাব্যে বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে ত্যাগ করে শ্রীঅরবিন্দের কাছে এসে তিনি সেই পেছনে ফেলে আসা কবির দ্বারাই হয়ে গেলেন বাকরুদ্ধ। তিনি তাঁর নিজস্ব সেই ভাষা, সেই বাণীর জগৎ সৃজন করতে পারেননি যেখানে প্রবেশ করলে কবির কণ্ঠ তাঁর অনন্য বিচিত্র কাব্যভাষা আমরা শুনতে পাব। 'রূপের নিখিল বাণীর জগৎ মিতালি করে। রঞ্জিত রাগে জাগে চিত্রালী গীতালি ঝরে।' তিনি নিজের ভাষা তৈরী করে ভাবকে মূর্তি দিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের বাণীর বীণায় তিনি অতীন্দ্রিয়-লোকের সুর সেধেছেন। প্রার্থনা করেছেন :

কবিরে তোমার কহিতে শিখাও
গভীর কথা।...
হৃদয় রক্তে যেটুকু সে পায়
তারি অনুভূতি যেন না হারায়
বাণী যেন তার বহে সুনিবিড়
বিমৌনতা।

রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই তিনি তাঁর নানা ভাবের ও দর্শনের কথা বলেছেন। সাধনার কণ্টকবিদ্ধ বেদনা, নানা দিব্য স্পর্শের অলৌকিক আনন্দ তাঁর কাব্যের মাঝে মাঝে অনবদ্য উপমায় চিত্রে ও চিত্রকল্পে এবং সঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন নিঃসন্দেহ : 'মাগো তোমার আকাশ-ভরা কোলে / হাসব

আমি শিশু চাঁদের মতো / দুলব তোমার জ্যোতির হিন্দোলে / ছায়াপথের তারকাদের মতো।' মায়ের ভাবে ভাবস্থ কবির কাব্য ঐ উপমায় চিত্রে চিত্রকল্পে মনোহরণ হয়ে উথলে উঠেছে স্থানে স্থানে। মন তারিফ করে কিন্তু বিস্মৃত হতে পারে না, রবীন্দ্রনাথের বীণাতেই কবি তাঁর বাণীটি ধরেছেন, সেধেছেন প্রাণের সুর। এবং এলিয়টের এ-কথা যদি সত্য হয়, new sensibility demands a change in idiom, তাহলে এ-প্রশ্ন মনে জাগবে, বাংলার মুখ্য কবিদের একজন কি হতে পেরেছেন নিশিকান্ত? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা নিয়ে এলিয়টের ঐ কথার প্রেক্ষিতে নিশিকান্তর কাব্যের মূল্যায়ন আজ কাব্য রসিকদের অবশ্য কর্তব্য। এবং কাব্যের ক্ষেত্রে এই বিচারে কবিগুরু শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ সমর্থন আছে। ভক্তির দিক থেকে নয়, কবিতার দিক থেকেই কাব্যের বিচার একান্ত সঙ্গত। নিশিকান্তর অধিকাংশ গুরু-ভাইরা তাঁদের গুরুর ঐ আপ্তবাক্যটি সম্পর্কে একেবারেই অচেতন। শ্রীঅরবিন্দের কাব্যরসিক শিষ্যরা কি নিশিকান্তর কবিতার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন কাব্যের দিক থেকে?

নিশিকান্তর কাব্য মুখ্যভাবে রবীন্দ্রনাথের ভাষা-নির্ভর। কিন্তু কবির পণ্ডিচেরী অধ্যায়ের কাব্যে দেখা দিয়েছে কখনো কখনো তাঁর নিজস্ব ভাষা। ভাবস্থ গীতিকবি তান্ত্রিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন বস্তুর রূপ, পণ্ডিচেরীর ঈশাণ কোণের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কবি তাঁর স্বতন্ত্র বাণী খুঁজে পেয়েছেন, মানবীয় বিচ্ছেদে তাঁর গভীর বেদনা-বোধ অনবদ্যভাবে হয়ে উঠেছে উৎসারিত, কিন্তু তা ক্ষণিক। তা রয়েছে কাব্যদেহে গৌণভাবে। তা তাঁর স্বতন্ত্র ও অনন্য কবি সত্তায় সমগ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তাঁর বাণীর জগৎ স্বতন্ত্র আবহমণ্ডল পারেনি গঠন করতে। এবং এটাই একটা প্যারাডক্স, রবীন্দ্রনাথের দুর্ধর্ষ প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে আপন মৌলিকতা নিয়ে যে নিশিকান্তর কবিতা শান্তিনিকেতনে বিকশিত হয়ে উঠছিলো—সে বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গেলো পণ্ডিচেরীর অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথেরই দ্বারা। তবু এ কথা তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে অনুভব করব নিশিকান্ত

একজন সত্যকার কবি-চিত্রকর।

এবার পণ্ডিচেরীর কবি নিশিকান্তর কাব্যের একটু আস্বাদ লাভ করা যাক :

চাইনে তোমার বিজয়-শংখ চাইনে বরাভয়ের পানি।
বিদ্রোহ মোর বিলুপ্ত হোক, বাজুক পরাজয়ের বাণী।
তোমারই ভয় সার জেনেছি
তোমার কাছেই হার মেনেছি
আমার মাথার মুকুট ভেঙে তোমার পায়ের নুপূর গড়ো।

আর একটু শোনাই :

পাষাণের বৃষমুণ্ড অধিষ্ঠিত শ্মশানের পরে
নির্জন প্রান্তরে
পাষাণের বৃষমুণ্ড একচক্ষু মেলিয়া সদাই,
দুই চক্ষু নাই।

মাতৃচরণে আত্মসমর্পণের অভীপ্সা নিয়ে চলা কবির কণ্ঠ শুনি :

হায়রে পথের অন্ধ ছেলের ডাক শুনে মোর চলা অচল।
আমায় শুধু দেয়না যেতে তৃণলতার মঞ্জরী দল।

কবির কাব্য কাকলি আর একটু শুনিয়েই শেষ করি কাব্য পরিচয় :

জানি না তো কার চিঠির টুকরো খানি
হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ লেগে উড়ে আসা।
এক কোণে তার লেখা আছে, 'ওগো রাণী,
নিয়ো মোর ভালবাসা।'
কোনো রাজা কোনো রাণীরে পত্র দিল
কুটি কুটি করে রাণী যে তা ছিঁড়েছিল।
এতো ছেঁড়াতেও ছেঁড়েনি তো সেই ভাষা
নিয়ো মোর ভালোবাসা।

নিশিকান্তর কাব্য প্রসঙ্গ শেষ করি আর একটি কথা বলে। পণ্ডিচেরী এই শ্রীঅরবিন্দ শত বার্ষিকীতেও কবি নিশিকান্তর প্রতি একটি মহৎ কর্তব্য পালন করেননি। আজও নিশিকান্তর শান্তিনিকেতনের কবিতাবলীকে অপ্রকাশিত রেখে কবির সামগ্রিক পরিচয়কে আবরিত করে রেখেছেন। সাধক নিশিকান্তর আধ্যাত্মিক কবিতাকেই পণ্ডিচেরী মূল্য দিয়েছেন কিন্তু অবিচার করেছেন শান্তিনিকেতনের জীবনধ্যানী কবি নিশিকান্তর প্রতি। এবং নিশিকান্তর শান্তিনিকেতনের কবিতাবলী পড়ে এমন কথা মন কিছুতেই মেনে নেয়না মণীষী সমালোচক নলিনীকান্ত এবং কবির কাব্যরসিক বন্ধুরা শান্তিনিকেতনের অধ্যায়ের কাব্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তা সত্ত্বেও প্রথম অধ্যায় প্রকাশ করা হয়নি। কাব্যবিচারে কবির সেই প্রথম পর্য্যায়ের কবিতাবলী আধ্যাত্মিক কি না এ প্রশ্ন ওঠে না। মনে পড়ে কবি এ.ই ও ইয়েটস সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের গভীর কাব্য বিচার প্রসূত অভ্রান্ত উক্তিটি। তিনি বলেছেন, আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে এই ইয়েটসের চেয়ে গরীয়ান হলেও কবি হিসেবে ইয়েটস অনেক বড়ো এ.ই-র চেয়ে। শ্রীঅরবিন্দের মতে কবিতার দিক থেকেই কবির কাব্যের বিচার হওয়া উচিত। তাই এই ক্ষোভ জাগা অসঙ্গত নয় যে শান্তিনিকেতনের কবি নিশিকান্তকে প্রকাশ না করে পণ্ডিচেরী তাঁর সামগ্রিক পরিচয়কে আবরিত করে রেখেছেন এবং যাঁরা কবিকে সমগ্রভাবে দেখে আলোচনা ও মূল্যায়ন করতে উৎসুক তাঁদের সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

নিশিকান্ত প্রায় চল্লিশ বছর ছিলেন পণ্ডিচেরী আশ্রমে। প্রথম দশ বারো বছর ছিলেন সুস্থ। তারপর অবশিষ্ট জীবন কাটে করাল ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে। অসুরের মতো বলশালী দেহে একে একে শেকড় গাড়তে লাগল, রক্তমোক্ষণ করা আন্ত্রিক ক্ষত, টি-বি, তার ফলে মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে উঠেছে রক্ত, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রবল রক্তের চাপ এবং বহুমূত্র। এইসব কালান্তক ব্যাধি নিয়ে তাঁকে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে দেখেও

দেশে পাশ করা এক অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্তব্য করেন 'এ রুগী যে এতোদিন কী করে বেঁচে থাকতে পারে, তা মেডিক্যাল সায়েন্স দিয়ে এক্সপ্লেন করা যায় না।' মাঝে মাঝে যখন নিশিকান্তর অবস্থা খুব সংকটজনক হয়ে উঠত, তখন তাঁকে পাঠানো হতো হাসপাতালে, ডাক্তারদের গম্ভীর ও বিষণ্ণ মুখ দেখে তিনি বলতেন : 'আপনারা যাই মনে করুন আমি ঠিক ফিরে যাব।' নিশিকান্ত ফিরে এসেছেন আশ্রমে। করেছেন চলাফেরা। ডঃ চন্দ্রশেখর তাঁকে বলেছিলেন হেসে, 'আপনার অসুখ সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই তো ঠিক হয়না।'

এ অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হয় ? ঐ করাল ব্যাধিগ্রস্ত রুগী কেমন করে ডাক্তারদের ধারণাকে বানচাল করে ফিরে এসে নিজের কাজে মন দিয়েছেন, চলাফেরা করেছেন ? বড়ো বড়ো ডাক্তাররা এর কারণ নির্ণয় করতে না পেরে ধাঁধায় পড়েছেন।

এর গভীর মূলে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমার প্রেম কালান্তক ব্যাধিগ্রস্ত নিঃস্ব কবির প্রতি। The love that flows from the one Mother's breast / Healed with their hearts the hard and the wounded world. শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমা নিশিকান্তর আরোগ্যের জন্য যে চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, তার মধ্যে তাঁদের অতল করুণা। সেই মহাপ্রেমই নিশিকান্তর আত্মাকে জাগ্রত করে তাঁকে দান করেছিলো এক অপরিমেয় আত্মিক শক্তি। সেই মহাপ্রেম গ্রহণ করার শক্তি তাঁর ছিলো বলেই নিশিকান্ত সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে তাকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন।

তাই তো নিশিকান্তর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিলেও তাঁর ব্যাধি চেতনায় মুদ্রিত হয়ে যেতে পারেনি। তিনি কাকেও শোনাননি তাঁর যন্ত্রণার কথা। 'বাহির ভুবনে স্মরণে যখন খরকণ্টকে উঠিছে ভরিয়া / অন্তরে আমি জাগি আনন্দে রক্তকমল চয়ন করিয়া।' এতো কথার কথা নয়— প্রত্যক্ষ বাস্তবে সত্য। তাঁর প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের জীবনে কাব্যে

চিত্রে সঙ্গীতে হিউমার-এ কথকতায় তিনি তাঁর আনন্দময় শিল্পীসত্তাকে বহুমুখে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাব্য সঙ্গীত ও চিত্রের কথা বলেছি। এবার তাঁর হিউমার-এর কথা বলি।

হিউমার কথাটি বাংলা হাস্যরস অর্থেই গৃহীত। হাস্যরস বহু জাতের। কৌতুক, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ ঠাট্টা মস্করা রঙ্গ ভাঁড়ামি। ঐ অর্থে দেখলে নিশিকান্তর হাস্যে সর্বাধিক একটি রসেরই প্রাধান্য। সেটি হলো তাঁর কৌতুক। এবং নিজে না হেসে কোনো কৌতুকজনক ভঙ্গী না করে শুধুমাত্র কথা দিয়ে তিনি রসক্ষরণ করতেন শ্রোতাদের চিত্তে। অনেকের হাস্যকৌতুকে কথাকে সাহায্য করে ভঙ্গী। এই ভঙ্গীর সহযোগিতা না পেলে তাঁদের কৌতুকে তেমন রসসৃষ্টি হয় না। নিশিকান্ত কেবলমাত্র কথার চাতুরী দিয়ে অনবদ্য রসসৃষ্টিতে পারঙ্গম হয়েছেন। প্রমাণ করেছেন তিনি অনন্য সাধারণ শিল্পী হাস্যকৌতুকের। অনাবিল অফুরন্ত তাঁর হাস্যরস সৃষ্টি।

রাস্তার একপাশে ফুল বাগান দেওয়া কবি নিশিকান্তর বাড়ি। ঘরের সামনেই মস্ত বকুল গাছ। পথের ও পাশে আশ্রমের ডাইনিং রুম। বহু আশ্রমবাসী কবির বাড়ীর পাশ দিয়েই ডাইনিংরুমে খেতে যান। নবাগত কেউ জিজ্ঞাসা করলেন 'আপানার বাড়ি কোন জায়গায়?' নিশিকান্ত বললেন 'আমি খাইবার পাশ-এ থাকি।' সাহানাদি যে গলিতে থাকতেন নিশিকান্ত তার নামকরণ করেছিলেন, 'দিদি সাহানার গলি।' জুতো হাতে ঝুলিয়ে হন হন করে নিশিকান্ত রাস্তা দিয়ে চলেছেন, দূর থেকে দেখতে পেয়ে কোনো বন্ধু বললেন : 'কোথায় চলেছেন এমন করে?' নিশিকান্ত জুতোসুদ্ধ হাতটা তুলে বললেন : 'জুতোর বাড়ি।' জুতো মেরামতের কারখানার নাম দিয়েছিলেন জুতোর বাড়ি। আশ্রমের কি একটা ফাংসান—দারুণ ভীড়। নিশিকান্ত বসবার জায়গা পাননা কোথাও—এমনি ঠাসা। ঘুরতে ঘুরতে একজায়গায় দেখলেন কয়েকটি বালক। তারা জায়গা দিতে নারাজ দেখে নিশিকান্ত বললেন 'বসবার

জায়গা দাও বলছি, নইলে কোলে বসে পড়ব।' তারা তখন তাড়াতাড়ি জায়গা দেয় বসবার। প্রতি চলনে বলনে যে অজস্র হাস্যরস ছড়িয়েছেন নিশিকান্ত, সেগুলি নির্বাচিত করে প্রকাশ করলেও আর্টে তিনি কতবড়ো আর্টিষ্ট তার পরিচয় দেওয়া যায়। তাতে শুধু পাঠকের চিত্তে রসক্ষরণ করাই হয় না, নিশিকান্তর বহুমুখী শিল্পীসত্তার মূল্যায়নের পাকা দলিল রাখা যায়। যা রাখা তাঁর আশ্রম বন্ধুদের অবশ্য করণীয়।

কিন্তু নিশিকান্তর এই হাস্যকৌতুক অনবদ্য হলেও তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আর্ট নয়। তার চেয়েও যা শ্রেষ্ঠ গরীয়ান এমন কি তুলনাহীন বললেও অতি-শয়োক্তি হয় না, তা হলো নিশিকান্তর হিউমার। হিউমার হাস্যরস বটে কিন্তু তার যে জাতগুলির কথা এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে হিউমার তা থেকে স্বতন্ত্র। হিউমার-এ হাসি থাকে কিন্তু থাকে কান্নার সঙ্গে জড়িয়ে। সমালোচকদের মতে হাস্যরসের মধ্যে হিউমারের স্থান শীর্ষে। বাংলা সাহিত্য কাব্যে নাটকে নানা শ্রেণীর হাস্যরসের ছড়াছড়ি। শুধু নেই হিউমার। থাকলেও তা ছিটে ফোঁটা, তার কারণ হিউমার সৃষ্টির পক্ষে যে অবজেকটিভিটি, নির্মোহ অনাসক্ত দৃষ্টিতে জীবন-দর্শন, জীবনবোধে ব্যাপকতা ও গভীরতা এবং অহং বিলুপ্তি অপরিহার্য, তা লিরিকপ্রাণ বাঙালী সাহিত্যস্রষ্টাদের ধাতে নেই। তাই বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরসে যদিও পাঠকদের প্রাণকে তৃপ্ত করেছে, কিন্তু হিউমারের অভাব ঘোচাতে পারেনি। নিশিকান্তর মধ্যে সর্বপ্রথম দেখলুম ঐ দুর্লভ হিউমার তার হাস্যরসাভিনয়ে। সেখানে কোনো ভঙ্গী নেই, রঙ নেই, শুধু আছে অনাসক্ত বর্ণনা। নিশিকান্ত সম্পর্কে সেই অভিজ্ঞতার বিস্ময় ভুলতে পারিনি আজও।

কবেকার সে কথা কিন্তু মনে হয় যেন চোখের সামনে বর্তমানেও তা প্রত্যক্ষ। আশ্রমের এক দিদির বাড়ির ছাতে দিলীপদার গান উপলক্ষ্যে সেদিন নিশিকান্ত সাহানাদি নীরদদা রাণীদি এবং তাঁদের অন্তরঙ্গরা মিলিত হয়েছিলেন। দিলীপদা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। গানের

পর সবাই একজোট হয়ে নিশিকান্তকে ধরলেন, কমিক দেখাতে হবে। নিশিকান্ত কিছুতেই রাজী হন না। শেষ পর্যন্ত দিদিদের ও বন্ধুদের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি কমিক দেখাতে বাধ্য হলেন। আজ ভাবি সেদিন যদি তাঁর সেই কমিক না দেখতুম, তা হলে নিশিকান্তর সর্বশ্রেষ্ঠ আর্ট সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যেতুম। ভাগ্যে মস্ত বড়ো লোকসান ঘটত।

নিশিকান্তর সেই হিউমারের নায়ক রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ এবং বীরভূমের দুটি চাষা। পাত্র নির্বাচনের মধ্যেই মেলে নিশিকান্তর জীবন অঙ্গীকারের ব্যাপকতা। সেদিন তাঁর সেই হিউমারে অত্যাশ্চর্য চরিত্র চিত্রণ জীবন্ত করে আমাদের সামনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিলো, রবীন্দ্রনাথকে অবনীন্দ্রনাথকে এবং বীরভূমের সেই মাতাল চাষাকে যেন কথা বলতে দেখছি চোখের সামনে, কানে শুনছি তাঁদের কথার বিশেষ ভঙ্গী, চলন-চালন, এমন কি গলার স্বর পর্যন্ত। অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে হিউমারের কথাই বলি :

একটি ছেলে গিয়েছে অবনীন্দ্রনাথের কাছে। তার বড় সাধ আর্টিষ্ট হয়। অবনীন্দ্রনাথ তার কিছু হাতের কাজ দেখে বুঝলেন ছেলেটির দ্বারা ছবি হবে না। এই নির্মম সত্যটি নানা চাতুরী করে ছেলেটিকে জানিয়ে দিচ্ছেন। সেই জানানোর মধ্যে একদিকে শিল্পগুরুর নির্মম কর্তব্যের দুর্নিবার তাগিদ এবং তার পাশে দুঃখ-পাওয়া ছেলেটির জন্যে গভীর বেদনাবোধ, অবনীন্দ্রনাথের চরিত্রের এই চিত্রটি তাঁর সেই বিশেষ ভাষায় ভঙ্গীতে কণ্ঠস্বরে যে ভাবে মূর্তি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে হাসি কতটুকু ছিলো মনে নেই কিন্তু চোখে জল এসেছিলো।

আর সেই বীরভূমের মাতাল চাষার চরিত্র চিত্রণ ও বাচনভঙ্গী—এক আশ্চর্য সৃষ্টি। মনে হচ্ছিল, চোখের সামনে নিশিকান্ত নয়—বীরভূমেরই এক মাতাল চাষা আর তার বন্ধুর. বীরভূমি চাষার ভাষায় কথাবার্তা শুনছি। ঘটনা কিছুই নয়। এক চাষা তার এক বন্ধুর কাছে এসেছে দুটো টাকা ধার করতে। আগন্তুক চাষাটি এক বছর আগে এসে

দুটো টাকা ধার নিয়ে গিয়েছিলো। এক মাসের মধ্যে দিয়ে যাবে, এই শপথ করে। তারপর আর আসেনি। তারপর আবার এসেছে টাকা ধার করতে। মহাজন বন্ধু তো তার ভাষায় ধার চাওয়া বন্ধুকে দু'চার কথা শোনালে। উত্তরে তিরস্কৃত বন্ধুটি নানা ধানাই মানাই করতে করতে তার টাকা শোধ না দিতে পারার যে-কারণ বীরভূমি ভাষায় ব্যক্ত করতে লাগল তার মধ্যে ফুটে উঠল তার নিষ্ঠুর দারিদ্র্য এবং তার সংসার জীবনের সংকট। বর্তমানে তার ছেলের ব্যামো, ওষুধ পথ্যের জন্যে তার টাকা দরকার বলেই এসেছে। এবং সবচেয়ে লক্ষণীয় এই দরিদ্র বন্ধুটি কোনো করুণভাব প্রকাশ না করে কেন সে আসতে পারেনি তারই বিবৃতি দিয়ে গেছে। শুধু তাই নয় ওরই মধ্যে সে আবার একটুখানি তেজও প্রকাশ করছে অর্থাৎ ধার দিলে তো দিলে নইলে বয়ে গেলো—এমনি একটা ভাব। সেদিন নিশিকান্তর সেই বীরভূমি ভাষায় চাষার সেই ধানাই মানাই শুনে হেসেছি, কিন্তু দরিদ্র চাষার বেদনায় চোখে জল এসেছে। শেষ হবার পর রাণীদি বেদনাভরা কণ্ঠে বললেন, আহা! সেদিন তাঁকে নমস্কার জানিয়েছিলুম। আজও মনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে শিল্পী নিশিকান্ত শুধু কবি এবং চিত্রকর নন, বিশুদ্ধ হিউমারেরও সার্থক স্রষ্টা।

পণ্ডিচেরীতে সেদিন নিশিকান্ত রবীন্দ্রনাথের কমিক দেখিয়ে শেষ করেছিলেন। কমিকের বিষয়: শান্তিনিকেতনে একদল চীনা গায়ক এসেছেন কবিকে গান শোনাতে। গানের আসর বসেছে। শান্তি-নিকেতনের বালক-বালিকা থেকে সর্বশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী ভেঙে পড়েছে আসরে চীনা গান শুনতে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং আশ্রমের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত। গান সুরু হবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যথোচিত গাম্ভীর্য বজায় রেখে বালক-বালিকাদের বিশেষ করে সতর্ক করে দিলেন, গানের সময় কেউ যেন গোলমাল না করে। কিন্তু কোথায় ভেসে গেলো কবির সতর্কবাণী। যেই চীনাদের গান আরম্ভ হলো অমনি আসরে উঠল

উচ্চৈস্বরে হো হো হো হো হাসি। রবীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। একবার গলা-খাকারি দিয়ে হো হো-হাসি-ছেলেদের দিকে চেয়ে ভর্ৎসনা করলেন। মনে হলো যেন আমরা সেই আসরে উপস্থিত থেকে চীনাগানে রবীন্দ্রনাথের মজা পাওয়া, তাঁর কৌতুকমিশ্রিত ভর্ৎসনা, তীক্ষ্ণ কণ্ঠ এমন কি গলা-খাঁকারি পর্যন্ত বাস্তব সত্যের মতো চাক্ষুষ করছি। কানে বেজে উঠছে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বাচনভঙ্গী ও কণ্ঠের তীক্ষ্ণতা। সেদিন হিউমারের পর রবীন্দ্রনাথের এই চিত্রটিতে যে মজার আনন্দ নিশিকান্ত দিয়েছিলেন তাতে তাঁকে বলেছিলুম, সাবাস। আর তাঁর অবনীন্দ্রনাথ এবং মাতাল চাষাকে নিয়ে সেই অতুলনীয় হিউমার সৃষ্টি দেখে সেদিন এবং আজও মনে হয়, নিশিকান্ত যদি ও-আর্টে অতন্দ্র সাধনা করতেন তাহলে তিনি ভারতবর্ষের চার্লি চ্যাপলিন হতে পারতেন। মনে আছে ১৯৬৮ সালে পণ্ডিচেরীতে তাঁকে এই হিউমারের কথা বলতে তিনি হেসে বলেছিলেন, 'তোমার মনে আছে দেখছি।'

নিশিকান্তর এই হিউমার সৃষ্টিতে শিল্পীর যে মহৎ গুণগুলি প্রকাশ পেয়েছে, সেই গুণাবলী দেখি তাঁর আর একটি আর্টে। সে তাঁর গল্প-বলার আর্ট। তাঁর হিউমার ও গল্প বলার প্রেজেনটেশন অবিকল এক। গল্প কথনেও দেখি, কথকের কোনো ভঙ্গী নেই, রঙ নেই, কণ্ঠে নেই আবেগ। তিনি আত্মস্থ হয়ে বসে গল্প বলে যেতেন—বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই আহরিত হতো তাঁর গল্প। এখানেও হিউ-মারিষ্টের মতোই কথক উর্দ্ধাসীন। তাঁর দৃষ্টি নির্মোহ অনাসক্ত অবজেকটিভ। গল্পের মধ্যে তাঁর অদ্ভুত বস্তুনিষ্ঠা, মাত্রাজ্ঞান, নির্বাচন প্রতিভা, এবং অত্যাশ্চর্য চরিত্র সৃষ্টির প্রতিভা বিস্মিত করেছে। তাঁর গল্পে পাত্র-পাত্রীরা জীবন্ত, আমরা যেন তাদের চলাফেরা, মুখচোখের ভঙ্গী কণ্ঠস্বর পর্যন্ত, দেখতে ও শুনতে পাই। তাঁর গল্প শুনতে শুনতে মনে হয়েছে, গল্প বলার এতোবড় আর্টিষ্ট আর বুঝি চোখে পড়েনি।

নিশিকান্তর মুখে শেষ গল্প শুনি, ১৯৬৮-তে ঐতিহাসিক অরোভিল প্রতিষ্ঠার বছরে। যে অরোভিল-এ ভারতবর্ষ ও বিশ্বের সর্বদেশ ও প্রদেশের এমন কি রেড-চায়নার পর্যন্ত, প্রতিনিধি এসে ঢেলে দিয়ে গেছেন নিজের নিজের দেশের মাটি। বিশ্বের সর্বজাতির সর্বসংস্কৃতির এই মহামিলন পীঠে। এক বন্ধু বলেছিলেন, ইউনেস্কোতেও সর্বজাতির এমন একত্র সমাবেশ বোধহয় ঘটেনি।

ঐ পুণ্য বছরে নিশিকান্তর সঙ্গে দেখা। তার আগের বছর গেছি কিন্তু তখন তিনি হাসপাতালে। এবারে তাঁকে বাড়িতেই পেলুম সেই আগের মতোই প্রাণভরে। তাঁর টি-বি এবং অন্যসব মারাত্মক রোগ—তাই তাঁর স্বতন্ত্র ঘর, খাওয়ার কাপ বাসনও আলাদা। পাশের ঘরে তাঁর পরম স্নেহময়ী বিধবা ছোট বোন অপর্ণা। তাঁর দুটি বালক পুত্র নিয়ে থাকেন। নিশিকান্তর সেবার ভার নার্সদের উপর ছেড়ে দিয়ে শ্রীমা নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। তিনি অপর্ণাদি ও তাঁর দুটি ছেলের আজীবন ভরণপোষণের ভার নিয়ে তাঁকে বীরভূম থেকে আশ্রমে আনলেন—নিশিকান্তর সেবার যেন কোনো ত্রুটি না হয়। বলাই বাহুল্য, নিশিকান্ত পেয়েছেন প্রাণভরা সেবা। তবু মাঝে মাঝে ভীষণ অভিযোগ করতেন, বোন তার ইচ্ছামতো খাবার খেতে দিচ্ছেন না বলে।

অপর্ণাদির কাছেই চা খেতুম দুবেলা। নিশিকান্ত চা ও খাবার খেতেন নিজের ঘরে তক্তাপোষে বসে—খুব আস্তে আস্তে। দুবেলাই চা-পানের পর গিয়ে বসতুম—তাঁর সামনে চেয়ারে। তিন ঘণ্টা করে কাটত তাঁর নিকটতম সান্নিধ্যে। তিনি তাঁর গল্পের ঝুলি খুলতেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তাঁর গল্পে বিন্দুমাত্র রঙ ঢং নেই অথচ তাঁর গল্পে লাগত যেন অত্যাশ্চর্য এক জাদু। আমি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ শ্রোতা, তিনি কথক।

নিশিকান্তর বেশির ভাগ গল্পই মুখ্যভাবে চরিত্র-চিত্রণ। সেখানে চরিত্র রসটাই প্রধান। বলা যায়, আবেগ ও ভঙ্গীবর্জিত চরিত্রাভিনয়।

তাঁর অধিকাংশ গল্পই শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে। কিছু জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে। তাঁর গল্পে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের যে ঘরোয়া চরিত্র ফোটাতেন তাতে মনে হতো, তাঁদের অপূর্ব চরিত্র-রস গল্পের মাধ্যমে নয়—যেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় হৃদয়-মন ভরে পাচ্ছি। ঐ দুই মহীরুহ ছাড়াও তাঁর গল্পে পেয়েছি শান্তিনিকেতনের মাননীয় ব্যক্তিদের ও অখ্যাত কুশীলবদের। নিশিকান্তর কথকতার জাদুতে সব চরিত্রই প্রাণের আলোকে হয়ে উঠত অপরূপ দীপ্যমান। কোনো কোনো গল্পে শান্তিনিকেতনের কর্তা শিক্ষক ও কর্মীদের ঘর সংসারের স্নিগ্ধ ছবি, সঙ্গে সেই সব পরিবারের স্নেহের সম্পর্ক ছোট ছোট ঘটনায় ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলতেন। স্বাদু স্বাদু পদে পদে!

গল্পের মধ্যে মাতালের চরিত্র ফোটাতেও অদ্বিতীয় নিশিকান্ত। মনে আছে একদিন দুই মাননীয় ব্যক্তির নিভৃত কক্ষে মাতাল অবস্থার চিত্রটি নিশিকান্ত দেখালেন তার গল্পাভিনয়ে। দুজনের মধ্যে একজন জড়িত কণ্ঠে তাঁর মরমীর কাছে প্রকাশ করছেন প্রাণের গোপন খেদ। খেদের কারণ তিনি কোনো প্রতিভাবান ব্যক্তির মতো ভোগ করতে পাচ্ছেন না। এই নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে তাঁর একটানা খেদ চলছে। অন্য বন্ধুটি গুম হয়ে বসে। কখনো কখনো করছেন হুম হুম। মাঝে মাঝে কথার মাঝখানে বলে উঠছেন 'গু-গু-গু-গু-ণ'। শেষের মূর্দ্ধন্যটি উচ্চারিত হবার আগেই কণ্ঠ বিকল হয়ে থেমে যাচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, গুণীভোগ্যা বসুন্ধরা। এবং মরমী বন্ধুর মূর্দ্ধন্যরঞ্জিত শব্দটির খেদপরায়ণ ব্যক্তির উপর মৃদু প্রতিক্রিয়া। সে চিত্র অতুলনীয়। সে গল্পের অন্তর্নিহিত মর‍্যাল, মদ্যপান করে যার অপেক্ষাকৃত কম নেশা হয়, তিনি ঐ রকম বক্তা হন। যার খুব বেশি নেশা হয়, তিনি গুম হয়ে যান। কখনো কখনো ঐ রকম শব্দ করেন।

নিশিকান্তর মুখে শোনা একটি গল্প বলি। এ গল্পটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। আজও মনের পাতায় শিশির বিন্দুর মতোই ঝলমল করছে।

শান্তিনিকেতনের অন্যতম প্রধান কর্মী রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ কালী-মোহন ঘোষকে বন্ধুরা রহস্য করে বলতেন এ, জি-র ভাই কে, জি। কেন ঐ কথা বলে বন্ধুরা রহস্য করতেন? কারণ কালীমোহন তাঁদের তাঁর জীবনের একটি গল্প শোনাতেন।

সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন। দেশের সর্বত্র দারুণ ঔৎসুক্য। নরম ও গরম পন্থীদের উত্তেজক নাটকাভিনয় হবে। গেছেন সুরাটে তুই দলের সর্বজনমান্য নেতৃবৃন্দ। ডেলিগেট ও বহিরাগত দর্শকে ভরে গেছে সুরাট গেছেন চরমপন্থীদের নেতা অরবিন্দ ঘোষ সেই অধিবেশনে। দারুণ টেনশন। 'দেশ একটু বেচাল হলেই সুরাট হয়।' মন্তব্য করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী।

অরবিন্দের থাকার জন্যে স্বতন্ত্র বাড়ি ঠিক করা হয়েছিলো। তিনি সেখানে উঠলেন।

কালীমোহনও গিয়েছিলেন সুরাটে ডেলিগেট হয়ে। সেদিন অরবিন্দ অধিবেশনে যাবেন না। বাড়িতেই থাকবেন। কিন্তু তাঁকে তো একা রাখা যায় না। তাঁর তদারকের জন্যে তাঁর প্রয়োজন মেটাতে একজন লোক তাঁর কাছে থাকা দরকার। কর্তাব্যক্তিরা কালীমোহনকে রেখে গেলেন অরবিন্দকে দেখাশোনা করার জন্যে।

অরবিন্দ ঘরের অন্তরালে। কালীমোহন ঘরের বাইরে বসে বসে দেখছেন; নরম ও গরমপন্থী তুদলেরই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা স্বতন্ত্রভাবে আসছেন অরবিন্দের কাছে। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলে যাচ্ছেন। এমনি চলছে যাতায়াত। ওদিকে অধিবেশনে উত্তেজক নাটক চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

কালীমোহন বসেই আছেন—একা চুপচাপ। ঘরের ভেতর কোনো সাড়াশব্দ নেই। যাঁর প্রয়োজনের জন্যে বসে থাকা।

অনেকক্ষণ পরে সহসা কালীমোহন যেন চমকে উঠলেন। অরবিন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে এলেন। কালীমোহনকে দেখে

বললেন তুমি এখানে বসে ? মিটিঙে যাওনি ?

কালীমোহনের মনে হলো ওরকম কোমলকণ্ঠ তিনি বুঝি কখনো শোনেননি।

কালীমোহন সবিনয়ে জানালেন, তার যদি কিছু দরকার হয়—

অরবিন্দ বললেন, না না আমার কিছু দরকার নেই। তুমি মিটিং শোনোগে; বলে তাঁর কাঁধে হাতখানি রেখে একটুখানি এগিয়ে দিলেন।

উত্তরকালে শান্তিনিকেতনের সুদীর্ঘজীবনে কালীমোহন সকলের কাছেই করেছেন এই গল্প। একবার নয় বারবার। হেসে বলেছেন : 'আমি যোগযাগ বুঝি না কিন্তু ঐ একদিন যা দেখেছিলুম, তা ভুলতে পারলুম না।'

এই কারণে কালীমোহনকে সকলে রহস্য করে বলতেন, এ; জির ভাই কে. জি।

নিশিকান্তর ঐ গল্পটিতে কালীমোহনের অন্তরাত্মা যেন আমার চোখে বিদ্যুৎ ঝলকে উদ্ঘাটিত হয়েছিলো। অরবিন্দের একটু স্পর্শ, তাঁর সুধাক্ষরা বচনের অনির্বচনীয়তায় তাঁর আত্মা মুহূর্তেই যোগযুক্ত হয়ে গিয়েছিলে যোগীশ্বরের সঙ্গে। তাই তো সুদীর্ঘ জীবন শান্তিনিকেতনের সূর্যচন্দ্র জ্যোতিষ্কদের নিবিড় সান্নিধ্যে থেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীদের সংস্পর্শে এলেও তাঁর প্রাণে অনির্বাণ অগ্নির মতো জাগ্রত ছিলো সেই মুহূর্তগুলি। আর সেই যোগযুক্ত অবস্থার গভীর আনন্দে কালীমোহন চিরদিন সকলকে শুনিয়েছেন, সেই শাশ্বত মুহূর্তগুলির কথা। তাই সেই গল্পটির কথক কালীমোহনের তর্পণ করি। প্রণাম করি অবনতচিত্তে।

আজ শিল্পী নিশিকান্তকে যখন সমগ্রভাবে দেখি তখন দেখতে পাই তাঁর অতন্দ্র শিল্পসাধনায় দুটি বিপরীত ধারা একই সঙ্গে পাশাপাশি চলে এসেছে। তাঁর কাব্য সম্পূর্ণই সাবজেকটিভ আত্মভাবরঞ্জিত, ঈশ্বরমুখী। তাঁর হিউমার ও গল্প জগৎমুখী ও ব্যক্তিমুখী। এবং শিল্পবিচারে তাঁর হিউমার ও গল্পই কাব্য-সৃষ্টির চেয়ে গরীয়ান। কিন্তু তাঁর এই মহৎ সৃষ্টি

তাঁর সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর আমরা যারা তাঁর ঐ মহৎ সৃষ্টির রসাস্বাদ করেছি, তারা নটসূর্য গিরিশের মতোই আক্ষেপ করব : 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়।'

নিশিকান্তর সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে অনেক দিন। আনন্দে উজ্জ্বল বেদনায় ভারাক্রান্ত। তারই একটি দিনের কথা :

১৯৪১ সাল অক্টোবর মাস। পণ্ডিচেরীর পীয়রে বসেছিলুম নিশিকান্ত আর আমি। কত রাত্রি, খেয়াল নেই কারোর। হাওয়া বইছিলো হু হু করে। আকাশ আর সাগরের বুক ভরে অবিশ্রাম হু হু হু। একের পর এক ঢেউগুলি কী অব্যক্ত বেদনায় তটের উপর পড়ছিলো ভেঙে ভেঙে। সেই বেদনায় আঁধার অম্বরে নক্ষত্রগুলির বুক স্পন্দিত হয়ে উঠছিলো ক্ষণে ক্ষণে।

জনমানবহীন উপকূল। পীয়রে কেউ নেই। শুধু নিশিকান্ত আর আমি, পরের দিন সকালের ট্রেনে চলে আসি। তাই শেষবারের মতো পীয়রে বসতে এসেছি দুজনে।

বুকের ভেতরটা হু হু করছে। কাল চলে যেতে হবে। আবার কবে আসব ? কেউ কি জানে? দীর্ঘ পথ। পাথেয় আছে, প্রশ্ন আছে পরমায়ুর !

কত বৈকাল সন্ধ্যা রাত্রি এই পীয়রে এসে বসেছি আমরা দুজন। চোখ ভরে দেখেছি মেঘের বুকে সূর্যাস্ত লালিমা। সাগরের নীল ঢেউয়ে ঢেউয়ে রঙিন আকাশের হোলীখেলা। আকাশের বুকে চোখ মেলে ফুটেছে সন্ধ্যা তারাটি। তার সান্ত্বনায় প্রাণ স্নিগ্ধ শান্ত হয়েছে। অন্তরীক্ষে গুচ্ছ গুচ্ছ তারকার কুঁড়ি ফুটিয়ে নেমেছে সান্ধ্য অন্ধকার দিকচিহ্নহীন সাগরের বুকে।

আমার জীবনের দুর্যোগের অধ্যায়ে নিশিকান্ত আমাকে নিয়ে নিভৃতে এসে বসেছেন এই পীয়রে। পিতার মতো, বন্ধুর মতো, পরমাত্মীয়ের মতো বুকের সেই মমতা ঢেলে স্নিগ্ধ করে দিয়েছেন ব্যাধির জরজ্বালা।

মুখে কখনো কোনো বেদনার উচ্ছ্বাস ছিলোনা বা কোনো উপদেশ। শুধু ছিলো তাঁর সত্তা উৎসারিত গভীর সহানুভূতি আর শুভকামনার নিঃশব্দ সঞ্চারণ আমার মর্মে মর্মে। শত কথায় যা প্রকাশ করা যায় না। দুর্দিনের বন্ধু, আশ্রয়, সান্ত্বনা নিশিকান্ত—তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে হবে।

নিশিকান্তর গলাটি জড়িয়ে কাঁধে মাথাটি রেখে একসময় বললুম, কবি!

নিশিকান্ত সমাহিত হয়ে বসে। তাঁর দীর্ঘ আয়ত গভীর দুটি চোখ আকাশ আর সাগরের পরপারে স্থির। এক সময় অস্ফুট কণ্ঠে আস্তে আস্তে বললেন: 'জীবনে কত বড় বড় বাধা, কত বিপুল প্রলোভন এসেছিলো হীরেন, কিন্তু সে সব ছিঁড়ে সহজেই বেড়িয়ে এসেছি, কিন্তু এই যে তোমরা কাল চলে যাবে—আমার বুকের ভেতর কেমন করছে।'

চোখে জল এসেছিল। নিশিকান্তর জীবনে বড় বড় প্রলোভন, শক্ত শক্ত বাঁধনের কথা অবিদিত ছিলো না আমার। জীবনের পরম সৌভাগ্যের সোনার শৃংখল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে নিশিকান্তর দ্বিধা হয়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গভীর বাৎসল্যে নিশিকান্তকে বাঁধতে পারেননি ঐ সোনার নীড়ে। নিশিকান্ত ঐ নয়নাভিরাম নন্দনকাননের রূপে আর সঙ্গীতে বাঁধা পড়েননি। তাঁর প্রাণ আর একটা কিছু চেয়েছিলো যাতে মনে হয়েছিলো, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে।' তাই ঐ দুদ্ধর্ষ মোহিনী মায়ার অতিকায় বাধা ঠেলে নিশিকান্ত বেরিয়ে এসেছিলেন। শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে আসার সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, 'তুই একটা হার্টলেস ক্রিচার! তোকে এতো করে মানুষ করলুম, তুই আমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছিস? যেদিন দেখলুম তুই অরবিন্দ ঘোষের বই পড়ছিস, সেদিন থেকেই জানি তুই আমার কাছে থাকবি না।'

সেই মহাবটের ঝুরির বাঁধন কাটিয়ে নিশিকান্ত সাড়া দিয়েছিলেন, শ্রীঅরবিন্দের Call-এ। তাঁর সাবিত্রী মন্ত্রে, I have obeyed my

heart, I have heard its call. সেই সাড়া দেওয়ার মূলে এই কামনা ছিলোনা যোগ সাধনা করে আমি মহাকবি মহৎ শিল্পী হবো। যোগ-সাধনায় যাওয়ার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য, যাদের ঐ কামনায় কলুষিত হয়েছে—সেই কলুষের ফলে আত্মসাধনায় এবং শিল্পসাধনায় তারা কোনোটাতেই বিকশিত হতে পারেনি। তারা ঐ লোভে গিয়ে অধ্যাত্ম জীবনে ও শিল্পে ব্যর্থ হয়েছে; নিশিকান্ত মহাকবি বা মহৎ শিল্পী হবার লোভে যোগজীবন গ্রহণ করেননি। এবং তিনি তাঁর আত্মানুসন্ধানের সত্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমার কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে। নিশিকান্ত কতখানি অধ্যাত্ম উপলব্ধির অধিকারী হয়েছেন সে বিচারের ধৃষ্টতা আমার নেই কিন্তু মানুষ সম্পর্কে নিঃস্বার্থ প্রগাঢ় প্রীতি দরদ অনুকম্পা যদি অধ্যাত্ম সাধকের উন্নত অবস্থার অন্যতম লক্ষণ হয় তাহলে বলতেই হবে, নিশিকান্ত যোগজীবনে প্রাগ্রসর। তাঁর অতুলনীয় অনুকম্পা দরদ গভীরে অনুভব করেছি জীবনের আর্তক্লিষ্ট অধ্যায়ে। পেয়েছি মায়ের মতো সেবা। সে পরিচয় আমার জীবনে অবিস্মরণীয়। সেদিন বিদায়লগ্নে শিয়রে বসে নিশিকান্তর সেই মাতৃ হৃদয় উথলে উঠেছিলো।

পরদিন সকালের ট্রেনে আমাদের যাত্রা। আমি পুষ্পবৌদি তাঁর স্বামী ও শিশু কন্যা রমা ছিলুম দিলীপ রায়ের বাড়িতে। যাত্রার আগে দিলীপদার দক্ষিণের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি। দিলীপদা সাহানাদি রাণীদি নীরদবরণ আর আমরা। আরও অনেকেই বিদায় দিতে এসেছিলেন।

দিলীপদার ঐ চায়ের টেবিল আমাদের জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রত্যহ সকালে ঐ চায়ের টেবিলে বসে আমরা নীরদবরণের মুখে শুনতুম শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নীরদবরণের আগের দিনের কথাবার্তা। শুনতুম অধীর কৌতূহলে। আমাদের মধ্যে থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন যেতো শ্রীঅরবিন্দের কাছে। নীরদদার মাধ্যমে উত্তর আসত শ্রীঅরবিন্দের।

শুধু গুরুভার আলাপ-আলোচনাই শুনতুম না। নীরদদা আনতেন অজস্র হাস্যকৌতুক। পশলা বৃষ্টির মতো নীরদদা ঝরাতেন Talks with Sri Aurobindo গ্রন্থ। গণ্য নগণ্য কোনো শিষ্যই বাদ পড়ত না গুরুর হাস্য-পরিহাসের বিষয়ভূক্ত হতে। সূর্যের হাসির কিরণ তৃণ থেকে মহারণ্য সবার উপর বর্ষিত হতো সমভাবেই। তাইতো মাঝে মাঝে ভাবি, বুদ্ধের করুণার কথা জগৎ বিদিত। শ্রীঅরবিন্দের করুণার কথা জানে কজন? সেদিন বিদায়ের লগ্নে চায়ের টেবিলে বসে পড়ছিলো সেই করুণানিধির কত করুণাভরা হাসির পসলা এই টেবিলে।

দিলীপদার এই চায়ের টেবিলে প্রতিদিন জমায়েত হওয়া দাদা দিদিদের চলত শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস। সেই হাস্য-পরিহাসের মধ্যে একটি ছিলো, গুরুর কাছে ফোর্স চাওয়া। কিসের ফোর্স? সব—সব কিছুর। ধ্যান জমছে না, শরীর ভালো যাচ্ছে না ক্ষুধা হচ্ছে না, গানের সুর নামছে না, লেখার প্রেরণা আসছে না, শংকর লজে গিয়ে তেলেভাজা খাবার জন্যে রসনা লালায়িত হচ্ছে, অতএব নীরদদার শরণাপন্ন হয়ে 'গুরুকে ফোর্স দিতে বলো।' আর নীরদদা গুরুর কাছে গিয়ে প্রতিদিন ফোর্স চাওয়ার কথা জানাতেন।

একদিন ঐ চায়ের টেবিলের একজন নীরদদার মারফৎ শ্রীঅরবিন্দের কাছে দাদা-দিদিদের দেখাদেখি ফোর্স চেয়ে বসে। কোনো মাসিকে তার বন্ধ হয়ে যাওয়া অর্দ্ধসমাপ্ত উপন্যাসটি সমাপ্ত করবার প্রেরণার জন্যে। উপন্যাসটি মাসিকে প্রকাশিত হওয়ার সময় এক প্রকাশক কিছু অগ্রিম দিয়ে বইটা কিনে নিয়েছিলেন। মাঝপথে লেখাটি অসুস্থতার জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। লেখকটি চলে আসে এখানে—শ্রীঅরবিন্দের করুণায়, দিলীপদার গভীর স্নেহছায়ায়। এখানে এসে লেখার কোনো প্রেরণাই এলো না দেখে বেচারা লেখক মরীয়া হয়ে একদিন গুরুর কাছে ফোর্স চেয়ে বসল।

পরম বন্ধুবৎসল স্নেহময় নীরদদা সে বেচারার আর্জি কর্তার কাছে

পেশ করতেই একেবারে বাঘা জেরার মুখে পড়লেন : 'কি লেখা ? কোন্ কাগজে বেরিয়েছে ? কি নাম উপন্যাসের ? কোন্ প্রকাশক কিনেছে, কত টাকা অগ্রিম দিয়েছে ? ও কেমন লেখে ?' নীরদদা তো একটাতেও পাশ করতে পারেননি—সবেতেই ফেল। প্রিয় শিষ্যকে অমন করুণভাবে ফেল্ করিয়েও গুরুদেব নিষ্কৃতি দিলেন না। আবার বাঘা প্রশ্ন : দিলীপ ওর লেখা সম্বন্ধে কি বলে ? নীরদদা আবার ফেল। গুরু বললেন : 'যাও প্রোসোডিস্ট দিলীপকে জিজ্ঞাসা করে এসো, ও কেমন লেখে।' নীরদদা এসে হাজির দিলীপদার কাছে। করুণ কণ্ঠে তাঁর দুর্দশার কাহিনী এবং তাঁর আসার উদ্দেশ্য জানাতেই দিলীপদা প্রাণখোলা দরাজ হাসি হেসে উঠলেন। বললেন : 'শ্রীঅরবিন্দকে বলো ওকে লেখার ফোর্স না দিয়ে ভাইট্যালিটি দিতে।' দিলীপদার এই উক্তির মধ্যে মহৎ দরদের স্বাক্ষর।

এরপর সেই লেখার ফোর্সপ্রার্থীর প্রাণে এলো রান্না-শেখার প্রেরণা কারণ দু'একটি পদ না-শিখলে আশ্রমের রান্নায় রসনাতৃপ্ত হতো না বেচারার। দিলীপদা বলতেন : 'পুয়োর সোল, সাহানারাণীর কাছে একটু রান্না শিখে নাও।' সুতরাং দিলীপদার উৎসাহে দুই দিদির কাছে চলতে লাগল শিক্ষা। নীরদদা বিশেষ কাজ কর্মে ঐ সময় কখনো কখনো আসতেন দিলীপদার কাছে। দেখতেন, কলম নয়, সে প্রবল উৎসাহে চালাচ্ছে খুন্তি। কখনো কখনো নাছোড়বান্দা হয়ে নীরদদাকে চাখাতেন তাঁর রান্না। নীরদদা চেখে আমতা-আমতা করে প্রস্থান করতেন। একদিন শ্রীঅরবিন্দ দিলীপদার কোনো কথা প্রসঙ্গে নীরদদাকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'সেই নভেলিষ্ট কি করছে ?' লেখার জন্যে ফোর্স চাওয়ার পর শ্রীঅরবিন্দ কখনো কখনো তার কথা উঠলে তাকে সকৌতুকে নভেলিষ্ট বলে উল্লেখ করতেন। নীরদদা প্রচণ্ড বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'গুরু, সে আপনার কাছে লেখার ফোর্স চেয়েছিলো কিন্তু এখন যখনই দিলীপদার কাছে দুপুরের দিকে যাই, দেখি সে প্রবল উৎসাহে রান্না শিখছে।'

শ্রীঅরবিন্দ বললেন : 'ও—তাহলে আমার ফোর্স প্রপার চ্যানেলেই কাজ করছে।'

এমনি কত পুণ্যস্মৃতি পাখা মেলে চলে যাচ্ছিলো মনের আকাশে—সেই চায়ের টেবিলে বিদায়-লগ্নে বসে।

অন্তরঙ্গ পরিচিত সবাই এসেছেন। বাকী শুধু নিশিকান্ত। এই চায়ের টেবিলকে কেন্দ্র করে কত রূপ ব্যক্ত হতে দেখেছি আমরা। মনে পড়ছিলো সে-সব কথা।

আহারে অত্যাসক্তি দেখেই বোধহয় শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমা নিশিকান্তকে আশ্রমের রান্নার ভার দিয়েছিলেন। নিশিকান্তও আর্টেও পাকা আর্টিষ্ট। গুরু হয়তো ভেবেছিলেন, ওর দ্বারা শিষ্যের ভোজনাসক্তি কিছু ক্ষয় হবে। আশ্রমের প্রতিদিনের যে-খাদ্য সেখানে নিশিকান্তর ও আর্টে কেরামতি দেখাবার বিশেষ সুযোগ ছিলোনা কারণ সে রান্না একরকম ঘি তেল মশলা বর্জিত। স্নিগ্ধ সহজপাচ্য ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। সকালে আশ্রমে বেকারীর টাটকা রুটি, কলা চিনি এবং একপোয়া খাঁটি গরম দুধ ফরাসী কোকো 'ফোস্‌কো' দেওয়া। দুপুরে ফেন-না-গলা ভাত, একটা তরকারী, দই অথবা দুধ এবং কলা। রাত্রে রুটি একটা তরকারী ও দুধ কলা। স্বাস্থ্যের দিক থেকে অতুলনীয় হলেও রান্নার দিক থেকে খুব উৎসাহজনক মনে হতোনা অনেকেরই। তবে দিলীপদার কৃপায় এবং নিশিকান্তর প্রবল উৎসাহে আমাদের রান্নার সঙ্গে হাইজিনের ডাইভোর্স হতে পারেনি। নিশিকান্তর ঘটকালিতে ঐ দুই যেন মিলে দিলীপদার বাড়িতে ঘরকন্না করছিল। এবং নিশিকান্তও রান্নার আর্টে তাঁর অসামান্য দক্ষতা দেখাবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

একটা তরকারী দিয়ে ভাত খাওয়া যায় কিন্তু শুধু ডাল আর ভাত নির্বিকারে প্রসন্ন চিত্তে গলাধঃকরণে বোধ হয় অতি-মানস স্তরেই সম্ভব। আশ্রমে ভাতের সঙ্গে তরকারীর বদলে কোনো কোনোদিন ডাল হতো। আর সেদিন নিশিকান্ত রান্নাঘরে ডালের মস্ত হাঁড়িটা চড়িয়ে একেবারে

সোজা দিলীপদার চায়ের টেবিলে হাজির হতেন। চেয়ারে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আত্মসমাহিতভাবে বসে গভীরকণ্ঠে উচ্চারণ করতেন: 'দি-লী-প-বা-বু, আ-জ ডা-ল।'

ঐ ঘোষণা শুনে যে আমরা পুলকিত হতুম কোন্ মুখে বলি এ কথা। দিলীপদা তাঁর এই অসুস্থ অতিথির জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠতেন: 'যাও যাও হীরেন। রাণীকে খবর দিয়ে এসো। রাণী আজ এখানে খাবে।'

তার মানে খাবার আগে দু'একটি পদ বাঁধবেন রাণীদি। রসনায় পদলালিত্য আনবে রাণীদির শ্রীহস্ত।

যাবার সময় নিশিকান্তকে বলতেন দিলীপদা: 'কবি আপনি এতে একটু হাত লাগাবেন। পায়েস করবেন বলছিলেন। করুন না আজ।'

রাণীদির আগেই নিশিকান্ত এসে হাজির হতেন। নিশিকান্ত একাই হতেন পদকর্তা। কোনো কোনোদিন টিফিন-ক্যারিয়ারে নিজের খাবার নিয়ে হাজির। কাকেও কিছু না বলে রন্ধন কর্মে মগ্ন হতেন। দিলীপদার তো অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার ছিলো। কিন্তু কোথায় কি আছে রান্নাঘরে তা দিলীপদার চেয়ে অনেক বেশী জানা ছিলো নিশিকান্তর।

'কবি সাধক নিশিকান্তকে চেনো কিন্তু কবি খাদক নিশিকান্তকে তো চেনো না।' নিশিকান্ত বলতেন বন্ধুদের। এবং কবি সাধক এই খাদক হবার ফলেই অন্ত্রক্ষত রোগে আক্রান্ত হলেন। যখন ১৯৪১ সালে দ্বিতীয়বার পণ্ডিচেরীতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তখন তিনি রোগাক্রান্ত। ঐ রোগের দুঃসহ যন্ত্রণার কথা আমাদের কারোর অবিদিত ছিলোনা। কিন্তু নিশিকান্তর সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশায় আহারে বিহারে একবারও অনুভব করিনি তিনি ঐ রকম মারাত্মক অসুখে ভুগছেন। দিলীপদার এই চায়ের টেবিল সংলগ্ন চেয়ারের বুকে দীপ্ত জাগ্রত হয়ে আছে ধ্যানী নিশিকান্ত, কবি-শিল্পী নিশিকান্ত, রসিক হাস্যরসস্রষ্টা নিশিকান্ত, বালকের মতো লোভাতুর নিশিকান্তর বিচিত্র রূপ—আনন্দনন্দিত সত্তা। সেই আনন্দই তিনি মুক্তপ্রাণে পরিবেশন করতেন। ডাক্তার নীরদবরণ ছাড়া

আর কাকেও বলতেন না, অন্ত্রক্ষতের কী উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করছেন তিনি। একান্ত নিভৃতে অন্তরালে ব্যক্তিগত যন্ত্রণাকে গোপনে রেখে-ছিলেন। নিজের দুঃখ নিয়ে বিলাস করার প্রবৃত্তি তাঁর কখনো দেখিনি—যা কবি শিল্পীদের প্রায় সকলের মধ্যেই আছে। এ সংযম সাধকের পক্ষেই সম্ভব।

না প্রকাশ করলেও আমরা জানতে পারতুম নিশিকান্ত আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কারণ চায়ের টেবিলে এবং পীয়ারে তাঁর অনুপস্থিতি। একদিন এই সংকেত ধরে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি সেই আত্মসমাহিত শান্ত মানুষটি উন্মত্তের মতো ঘরের মধ্যে পায়চারী করছেন। আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে তিনি সেইরকম অস্থিরভাবে করতে লাগলেন পায়চারী। প্রায় আধঘণ্টা পায়চারীর পর এসে বসলেন বিছানায়। জিজ্ঞাসা করায় শুধু বললেন, কাল রাত থেকে মাঝে মাঝে যন্ত্রণা হচ্ছে। শুধু ঐ কটি কথা। আর একদিন শুধু সেই একটি দিন তাঁর মুখে রোগযন্ত্রণার আর্তি শুনেছিলুম, 'এ রুগ্ন দেহ নিয়ে আর থাকতে চাইনা হীরেন। এ যাক্, আবার নতুন দেহ নিয়ে জন্মাক। কবিতায় গানে ছবিতে আনন্দ ছড়াক।' শুধু ঐ দুটি দিন বেদনায় যন্ত্রণায় প্রকট হয়ে উঠেছিলো কিন্তু সে ক্ষণিকের। নিশিকান্তর আনন্দঘন সত্তা বেদনা যন্ত্রণাকে কোথায় লুপ্ত করে দিয়েছিলো।

সেদিন বিদায়ের সময় নিকটবর্তী হয়ে এলো। তখনো দেখা নেই সেই মানুষটির। একসময় এলেন নিশিকান্ত।

সেই বড় প্রিয় বড় পরিচিত মূর্তি। দোহারা চেহারা, মাথায় বড় বড় চুল। পরণে পাঞ্জাবী ও পেটে কোঁচা-গোঁজা খাটো কাপড়। আত্মসমাহিত মুখ, আয়ত দুটি চোখে ধ্যানময়তা। কথাবার্তায় পঠনে পাঠনে এমন কি ঢেউ তোলা হাস্যরসসৃষ্টির সময়েও মুখের এই আত্ম-সমাহিতভাবের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটেনি।

আস্তে আস্তে চেয়ারে এসে বসলেন নিশিকান্ত। হাতে গুটোনো সাদা

ফুলস্কেপ কাগজ। সংহতকণ্ঠে বললেন, কাল রাত্তিরে একটা কবিতা লিখেছি।

সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালুম আত্মসংহত স্বল্পবাক নিশিকান্তর দিকে। দিলীপদা সাহানাদি রাণীদি নীরদদা, আর আমরা।

এই চায়ের টেবিলে বসে আমরা কজন কতদিন শুনেছি নিশিকান্তর সদ্যলেখা কবিতা। কাব্য শোনার পর কত আনন্দের গুঞ্জন উঠেছে এই টেবিলে। বিদায়ের দিনে নিশিকান্ত শোনাতে এসেছেন কবিতা।

কবিতাটির নাম 'কঠিন ও কোমল।' নিশিকান্ত গভীর তন্ময় কণ্ঠে কবিতা পড়ছেন—শুনছি আমরা স্তব্ধ একাগ্রতায়। কবি বলছেন, 'বিলাস লীলার প্রাসাদ তাঁকে সেধে বিফল হয়েছে, তীক্ষ্ণ কাঁটার কুটিল বিঘ্ন রক্ত মাখা পায়ে দলিত বিচলিত করে এসেছেন তিনি মরুর মর্ম চিরে চিরে পথ করে এগিয়েছেন, কিন্তু আমায় শুধু যেতে দেয় না তৃণলতার মঞ্জরী দল।'

কবি নিশিকান্ত পড়ে চলেছেন—এসেছেন দ্বিতীয় স্ট্যান্জায়। আমরা স্তব্ধ হয়ে শুনছি। কবি বলছেন :

'পাগলা হাতির পা ভেঙে দি বাঘের বুকে বর্শা বেঁধাই,
হায়রে তবু হরিণ শিশুর নয়ন দেখে পথ ভুলে যাই।'

কবির অকূল অভিসারের পথে বাধা দেয় প্রলয় বায়ু কিন্তু পারে না। কবি সেই প্রলয় ঝঞ্ঝাকে ভেদ করে এগিয়ে চলেন তাঁর ধ্রুবালয়ের দিকে। কিন্তু হায় কবির সেই দুর্দম প্রগতিকে এক মুহূর্তে থামিয়ে দেয়—একটি ডানাভাঙা প্রজাপতি।

বন্যার দুরন্ত প্লাবন কবিকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে নিয়ে যেতে চায় ভাসিয়ে কিন্তু ব্যর্থ হয়। বন্যার জোয়ারে নয় কবি ভেসে যান সবুজ পাতার বুকে শিশির বিন্দুর ঝলমলানিতে। প্রলয়ের বাধায় নয় কবি আত্মহারা স্তব্ধ হয়ে যান সন্ধ্যা মেঘের বুকে রঙের দীপালীকায়। কিন্নরীর মোহিনী

মায়া নয়, কবির মন ভুলিয়ে দেয় ঝিল্লিতানের গানের রাশি। কবির দুর্দম প্রগতির কাছে পরাজিত হয় প্রখর সূর্যের প্রচণ্ড বিদ্রোহ। কিন্তু 'হায়রে পথের অন্ধ ছেলের ডাক শুনে মোর চলা অচল।'

গভীর আবেগময় কণ্ঠে নিশিকান্ত শোনাচ্ছেন কবিতার শেষ স্ট্যান্জা। বেদনার অপূর্ব আবেগে স্তব্ধ হয়ে শুনছি আমরা।

'আমার পথের কঠোরকে তো কঠিন হয়ে চূর্ণ করি।
আমার পথের কোমলকে যে আপন ভুলে জড়িয়ে ধরি।
হীরামণির হার ছিঁড়েছি অশ্রুমালা ছেঁড়া কি যায়?
চরণতলে লুটিয়ে কাঁদে চলা আমার হলো যে দায়।
আমায় যে হায় হার মানাল আমার পথের বাঁধন কোমল,
আমায় শুধু দেয়না যেতে তৃণলতার মঞ্জরী দল।

সেদিন ঐ কবিতা নিয়ে কেউ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি, সবাই মর্মে মর্মে কবির বেদনার সুধা লালন করছিলেন। এবং উত্তরকালে ১৯৬৭তে নিশিকান্তর গানের সুরকার সুগায়ক ও আশ্রমের সঙ্গীত শিক্ষক তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় দিলীপ বাবুর ঐ বাড়িতেই কবির জন্মদিন পালন করেন, নিশিকান্তর বন্ধুরা ও তিনুদা নিশিকান্তর কাব্য আবৃত্তি করেন। তিনুদা ও ছাত্রীরা করেন গান। সেই সভায় আমি নিশিকান্তর ঐ কবিতা রচনার ইতিহাস বলি এবং কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাই। মনে হচ্ছিল এ যেন সেদিনের কথা।

সেদিন আমাদের যাবার সময় হয়ে এলো। কিন্তু যেতে নাহি সরে মন। তবু উঠে বসতে হয় গাড়িতে। দিলীপদা চললেন আমাদের ট্রেনে তুলে দিতে।

গাড়ি চলতে লাগল—আস্তে আস্তে আস্তে। দুপাশে স্নেহময় স্নেহময়ী দাদা দিদিরা, আর আশ্রমের বন্ধুরা যাঁদের স্নেহে সৌজন্যে মধুময় হয়েছিলো আশ্রমবাস। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে তাকাই যাঁদের ছেড়ে যাচ্ছি তাঁদের দিকে।

তার মধ্যে দেখলুম নিশিকান্তকে। আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে। সে এক বিষাদ সমাহিত মূর্তি। আসবার আগে নিভৃতে হঠাৎ আবেগময় কণ্ঠে আমাকে বলেছেন, 'তোমার যখন খুশী যখন ইচ্ছে হবে এসো। যদি কোথাও জায়গা না হয় আমার ঘরে এসো।' তারপর ভাবাবেগ সামলে নিয়ে বলেছেন, 'আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শংকরাকে ডাকে।' মুখ ফিরিয়ে দেখি সেই বিষাদ-নিথর নিশিকান্তকে। যতক্ষণ দেখা যায় দেখলুম। তারপর ঝাপসা হয়ে গেল সেই মূর্তি।

পাঁচশ বছর বাদে আবার দেখলুম—নিশিকান্তকে। হাসপাতালের কেবিনে। বহু কঠিন ব্যাধির শরশয্যায় নিশিকান্ত। দমিত বুকে সন্তর্পণে অপর্ণাদি নীরদদা শচীনবাবু প্রভৃতির সঙ্গে ঘরে ঢুকতেই নিশিকান্ত বলে উঠলেন আমাকে দেখিয়ে, 'নীরদ নীরদ সেই মামলাবাজ সাহিত্যিক আবার এসেছে। ক্রমাগত মামার বাড়ির মামলার কথা শ্রীঅরবিন্দকে লিখে আমার কাছে পাঠাত—আর আমি তোমাকে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দের কাছে পাঠাতুম।' তারপর নানা রসিকতা, স্মৃতিকথা।

যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির শরশয্যায় শুয়ে এ কী প্রাণোল্লাস। তারপর যখনই গেছি—হাসপাতালের ঘর হয়ে উঠেছে কলাভবন-জলসাঘর। নিশিকান্ত হাসিতে রসিকতায় গল্পে মাৎ করে দিয়েছেন আমাদের। তার জন্যে বেদনাবোধের কোনো অবকাশ রাখেননি। অপর্ণাদি শচীনবাবু আমি প্রাণ খুলে হেসে আনন্দিত হয়ে ফিরেছি—সেই রুগীর ঘর থেকে—যার সম্পর্কে চিকিৎসকরা ভাবছেন, এ রুগী কেমন করে টিঁকে থাকতে পারে? চিকিৎসা বিজ্ঞান তো জানেনা যে নিশিকান্ত দেহ নয়—নিশিকান্তর অন্তরে জাগ্রত বিগ্রহ। তাই তাঁর চেতনা জড়ের দাসত্ব-মুক্ত। জড়কে অতিক্রম করে তিনি আনন্দ স্বরূপে বিরাজমান। 'পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।' তাই ব্যাধির শরশয্যায় নিশিকান্তর আনন্দ সঙ্গীত উৎসারিত—হাসপাতালের কেবিনে।

তাই সেবারে বিদায় লগ্নে বিষাদ মূর্তি নেই নিশিকান্তর। বিদায়

নেবার সময় বললেন, 'সাবধানে থেকো। নিজের কাজ করে যেয়ো। সাহিত্যিক বন্ধুদের বলো আমার কথা।'

তবু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ি। চলতে চলতে বেদনার বুকে ফুটে ফুটে উঠছিল সাবিত্রী মন্ত্র :

O Death I have triumphed over thee within.
I quiver no more with the assault of grief,
A mighty calmness seated deep within
Has occupied my body and the sense.
It takes the world's grief and transmutes
to strength,
It makes the world's joy one with the
joy of God.

অরুণ ভট্টাচার্য

অসময়ের কবিতাগুচ্ছ

১

বেঁচে থাকার এক নাম জীবন
এইটাই জানতাম ;
জানতাম না, এর অন্য নাম মৃত্যু।

২

রাজা, তোমার পথ চেয়ে বসেছিলাম।

যখন তুমি এলে
আকাশ জুড়ে ভয়ংকর মেঘের দামামা,
তোমার রুদ্র মূর্তি
ভাবলুম, এ বুঝি তোমার খেলার সাজ-পোষাক।

সেই থেকে বসে আছি
কবে তুমি খেলার সাজ পোষাক
খুলে ফেলবে,
সহজ হবে আমাদেরই মতন।

৩

আজকাল কী যে হয়েছে,
জানালাটা খুলতে ভয় হয়, পাছে
হু হু করে বাতাস ঢুকে পড়ে, কিম্বা

একগুচ্ছ রৌদ্র বুকের মধ্যে ঘুমোতে চায়।

হঠাৎ কোন শব্দ শুনলে চমকে চমকে উঠি
হঠাৎ বুকের মধ্যে কোন অজানা মন্ত্র এসে কথা বলে
কে কারা বিদ্যুৎ চমকের মত
ধাক্কা দিয়ে যায়।

জানালা খুলি না, বুঝি বা
হাওয়া আর রৌদ্র এসে
সব ওলট পালট করে দিয়ে যায়।

৪

একটা দমকা হাওয়ায় ঘরের জানালা সব
বন্ধ হয়ে গেল।
কেন জানি না
আমাদের কারুরই খুলবার সাহস হোল না।

একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ—
মাথা গুঁজে বসে আছি, আরাম কেদারায়
দম বন্ধ হয়ে আসছে,
আকাশ দেখা যায় না,
যায় না বাগানের পাশে টবের মৌশুমী গাছ।

কবে যে দেখবো এই আকাশ,
কবে তুমি সহজভাবে আবার
দরজা জানালা খুলে দিয়ে
ফিরে আসবে।

৫

যেদিকে তাকাও একটাই রাস্তা
দেখতে পাবে, একটাই বাগান
সম্ভবত গাছে একটাই ফুল।

কেন না, দ্বিতীয় রাস্তার কথা
আমাদের জানা নেই,
জানা নেই অন্য কোন বাগান আছে কি না
আর থাকলেও সেখানে
একটির বেশী ফুল ফোটে কি না।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

১. হাঁ

ডানাওলা পিটুলিগোলার সাধ উড়ছে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে
শাদা আগুনের ঝুরি খেতে খেতে চলেছে মাটির
লেপাপোঁছা দাওয়া সিজমনসার গাছ উঁচু চাঁচের দেয়াল
তিরতির করে দিনভর পুড়ছে চিকণ সবুজ
একটানা—রয়ানিবন্ধন
শ্রাবণকান্তার ভেঙে ঢুকে এলো···ভিত গলে যায়, বেড়া থেকে
চাঁচের আবডাল খসে খসে পড়ে কেবলই, কিছুতে
পার পাই নে—কাঁথায় আভর মুড়ি দিয়ে
ঘুমে মুখ চেপে—কিছুতেই
পার পাই নে—বুক বেয়ে বেয়ে ওঠে সবুজ ফুলকির
অবশ কুহক, ছেঁড়া জালের হাঁ—বুভুক্ষু, অতল···

২. স্বপ্ন

অবাক সুবাসী লতা ঢুকে এলো ঘরের কানাচে।
ঘরে ঢুকে সলতে উসকে
পাঁচালি পড়ছে—ঠিক ভরসন্ধ্যেটা—আলগোছে
লুকিয়ে—হঠাৎ দেখে কুলুঙ্গিতে মস্ত এক শতদল গাঁদা
সোনার চুড়োর মতো ঝিকিয়ে উঠলো···এইভাবেই একদিন
সুলক্ষণ উড়ে পড়েছিল নাকি পাশের বাড়ির চিলেঘরে··· ?

সবুজ সবুজ জাদু শষ্পমাদকের মতো ছেয়ে আছে ঘর···
পাড়া ছুটে এসে দেখে স্পষ্ট দুটো দাঁত—অসহায় সুখে
ইচ্ছে ঢলে পড়ে আছে গেরস্তবৌয়ের রূপ ধরে !

কালীকৃষ্ণ গুহ

১. বিভাস

বারবার একটি বিড়াল আসে।
সাদা কাগজের ভিতর থেকে উঠে আসে বিষণ্ণতার স্মৃতি, কালো কাক
অজস্র হলুদ চিত্রকল্প—
উৎসব অথবা মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, বাড়ি-ভর্তি লোক আসে—
রুক্ষ চুল—কতো কথা বলে!
তারপর সমস্ত কোলাহল থেমে গেলে একটি বিড়াল এসে
নিঃশব্দে দাঁড়ায় অন্ধকারে।

২. অনেকদিন পর আমাদের দেখা হলো, তাপস

অনেকদিন পর আমাদের দেখা হলো। কিন্তু তাপস, তুমি আমার
ভাষা বুঝতে পেরেছিলে? আমাদের ভাষার নিঃসঙ্গতা
অস্বীকার করে আমাদের প্রথম যৌবনকাল—
অন্যরকম হওয়ার কথা ছিলো আমাদের ভবিষ্যৎ।

সেবার এক বিকেলবেলা আকস্মিকভাবে মারা গেলেন তোমাদের মা—
আর একদিন সহসা পঙ্গু হ'য়ে পড়লো তোমার এক পরিশ্রমী ভাই, যে আজ
দশ বছর ধরে একটি খাঁচার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘুমুতে পারে না।

তাপস, লক্ষ্য করো, এক বস্তুহীন নিয়তির ভিতরে কিরকম অস্পষ্টভাবে
বেঁচে রয়েছি আমরা,

ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের পরিচয়—

তাপস, তুমি আমার ভাষা বুঝতে পারো নি, আমরা কেউ কারও ভাষা
বুঝতে পারি না।
কতোদিন তবু আমরা পরস্পরের মুখের দিকে অর্থহীনভাবে
তাকিয়ে থাকবো? কতোদিন

৩. বৃক্ষ

তোমাকে নিয়ে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে, বৃক্ষ।
বলা হয়েছে তোমার পবিত্রতার ভিতর থেকে নিয়তি মাথা তোলে, তার
পুরনো মুখ তোলে।
অজস্র কবির কাছে ঋণ রয়েছে তোমার।

বৃক্ষ, আজ তুমি একজন কবির ঘুমের মধ্যে শান্ত ডালপালা ছড়িয়ে দাও
যথাযথ নির্জনতা দাও।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

১. অনিবার্য

বুকের প্রদীপ নিঃসঙ্গতায় জ্বলে ওঠে ;
অনুপম অন্ধকারে কিছু স্মৃতির বিচ্ছুরণ নিদারুণ ;
উদ্যত তলোয়ারে রক্ত ঝরে ;
শুধু দু'হাত আগলে ব্যর্থতাকে দূরে রাখা ;
তবু শিখা কাঁপে ;
মায়াবী ছায়া সরীসৃপের মতো
নড়ে চড়ে ওঠে ॥

২. মুখোশ

পাশাপাশি সকলেই হাঁটছে
অথচ কেউ কাছাকাছি নয় ;

পাশাপাশি সকলেই অথচ
কেউ কারো মুখোমুখি নয়
গায়ে গা লাগে পায়ে পা
নিঃশ্বাস ছুঁয়ে যায় কাঁধ
উড়ন্ত চুল কানের পাশে
অথচ মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
যে যার মতো
নিস্তব্ধতাকে ভেঙে
সদর রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায় ;

এমনি করে কিছু মানুষ
ছত্রিশ কোজাগরী পূর্ণিমা
পার করে দেয় ; তারপর
অন্য অমাবস্যায় তাদের কান্নায়
অরণ্য কেঁপে ওঠে ;

কোনো এক সকালে
সবুজ ঘাসে
রাখালেরা কুড়িয়ে পায়
অজস্র রঙিন মুখোশ ॥

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

অসীমকুমার ঘোষ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দ্দশ সন্তান রবীন্দ্রনাথ। এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা নিয়ে ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করলেন। সাহিত্য, সংস্কৃতির যে কোন ক্ষেত্রেই বিচার করা যাক্ না কেন, রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম অবিস্মরণীয় প্রতিভা। তাঁর সৃষ্টির ছায়াপথে আগেকার শতাব্দী সমূহের সাহিত্যপ্রয়াস বিগত-উত্তাপ ও বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যলোকের বিস্তৃতি আমাদের যুগকে অতিক্রম করে একাধিক উত্তরপুরুষের উদ্দেশ্যে কল্যাণ মন্ত্র উৎসারিত করে দিয়েছে। যে জীবন-দেবতা চিন্তা ও বাণীর অগোচরে থেকে মানুষের জীবনে অসংখ্য মুহূর্তে অসংখ্য ভঙ্গীতে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন, রবীন্দ্র কাব্য-মাটিতে অভাবিত ও অবারিত রূপতরঙ্গে তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হৃদয়বীণার সব কটা তার সবরকম মূর্ছনায় তরঙ্গায়িত হয়ে রয়েছে তাঁর লেখনীর স্পর্শে। রসসৃষ্টির বাঙ্‌ময়ী রূপে রবীন্দ্রনাথ ভাস্বর হয়ে রইলেন চিরকালের জন্য।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাঁর দীর্ঘজীবনে শিল্পসাহিত্য ও সঙ্গীত-চর্চার এক নিরলস ও একাগ্র সাধনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সাহিত্য ও সঙ্গীত তাঁর আজীবন সাধনার বস্তু ছিল। পৃথিবীর যে-কোন যুগের আসনে তাঁকে শ্রেষ্ঠ গীতিকার রূপে আখ্যা দেওয়া যায়। নাটক, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, উপন্যাস, সমালোচনা, হাস্যরস,—সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর গতি সচ্ছল এবং তাঁর অবদান শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। এই বহুমুখী সাহিত্য-সাধনা তাঁর সৃষ্টিকে সার্থকতার মোহনায় নিয়ে গিয়েছে। তাঁর কাব্যপ্রতিভার প্রবাহ জীবনের সর্বদিগন্ত-ব্যাপী প্রান্তরকে প্লাবিত করে বয়ে চলেছিল। কিন্তু অগোচরে, বাণী-অর্চনার আর একটি প্রবাহ ধীরে ধীরে উৎস থেকে বেরিয়ে এসেছে।



রবীন্দ্রনাথ : স্কেচ্

"বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সৌজন্যে"

নিস্তরঙ্গ নিষ্কম্পেল তার প্রবাহ। স্থির ও অবারিত সাধনায় চলেছিল তার আত্মস্ফূর্তি। সে হচ্ছে তাঁর চিত্র শিল্প সাধনা। তিনি ছিলেন সর্বাঙ্গীন শিল্পী; সব রকম শিল্পকর্ম প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন করার মত আশ্চর্য্য প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কি ভাবুক, কি দার্শনিক হিসাবে, কি কবি কল্পনার ক্ষেত্রে তাঁর ধারণা, তাঁর তত্ত্বদর্শন তাঁর জীবন উপলব্ধি প্রভৃতির সার্থক মিলন থেকে উদ্ভূত তাঁর সমগ্র সৃষ্টির আলোকে চিত্রশিল্পের প্রয়াস ও তাঁর প্রচেষ্টা আমরা অনুধাবন করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য সৃষ্টি যা সহজাত প্রবৃত্তির রূপান্তরের কাছাকাছি। তাঁর শিল্পকর্ম ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটি পরিণত অধ্যায়ের ন্যায় এবং প্রকাশের একটি বিকশিত পরিপূরক হিসাবে আবির্ভূত হয়। তাঁর শিল্পকলা তাঁর বিশ্ব সমীক্ষার অন্তর্গত; জাতীয় এবং মানবিক কাজের সঙ্গে, তাঁর লক্ষ্য এবং নৈতিক তত্ত্বের সঙ্গে এই শিল্পকলার সঙ্গতি বর্তমান; তাঁর মতে শিল্প সত্যকে রসের মূর্তিতে পরিবেশন। অন্তরের উপলব্ধিতে সত্যকে যখন এমনি সমগ্ররূপে পাই, তখন আমরা অন্তরের দিক থেকে প্রবুদ্ধ হই। এই প্রবুদ্ধ হওয়ার দ্বারা যাকে জানি তাঁকে বলি রসো বৈ সঃ।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার মধ্যে প্রচলিত ধারায় রসানুসন্ধান বা গবেষণা করতে গেলে ভুল করা হবে, প্রচলিত ধারাতে রবীন্দ্রনাথ চিত্রসৃষ্টি করবার চেষ্টা করেন নি। সেই কারণে শিল্প সমালোচকেরা রবীন্দ্র-চিত্রকলার মর্মকথা বৈয়াকরণিকের দৃষ্টি নিয়ে যদি বিচার করতে বসেন তাহলে তা হতাশাই বহন করে আনবে, কিন্তু তবুও এই শিল্পের বিচিত্রতার সম্মুখীন হয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিপাত করলেই উপলব্ধি হবে কবির অবিরত প্রবহমান জীবনে এতকাল কোথায় অবলুপ্ত ছিল। এই উপলব্ধি থেকে মিলবে শিল্প বিকাশের সন্ধান। আধুনিক শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে যে কোন মহৎ সৃষ্টির রহস্য বা মহত্ত্ব ধরা পড়েও কোন শিল্প সংস্থাপনা সঙ্গতি বা কোন সঙ্গত কারণকে উপলক্ষ্য করে—যা সেই মহৎসৃষ্টির বিষয়বস্তু এবং

উপকরণকে আশ্রয় করে রয়েছে। বিভিন্নকালের শিল্পকলা বা অন্যান্য রসসৃষ্টির মূলগততত্ত্ব, বিশেষ করে আধুনিক কালের যে কোন শিল্পনীতির অন্তর্নিহিত সত্য এবং তার রস সঞ্চার হয়েছে এর ওপরে। সেই আদর্শে রবীন্দ্রনাথের শিল্পলিপি কতখানি আধুনিক তা বিচার্য বিষয়। সমগ্র বিশ্ব শতসহস্র রূপবৈচিত্র্যে নিজেকে প্রকাশ করেছে। কিন্তু কিছু থাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে, রবীন্দ্রনাথ এই নিরুক্ত অদৃষ্টকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শিল্পক্ষেত্রের সীমান্ত বিশ্বরূপ রেখায় দাঁড়িয়ে দেখেছেন যে প্রকৃতির শত-সহস্র রূপ নানা ভাবে ও বর্ণনায় রঙ্গে রসে ও রূপে কি ভাবে ছড়িয়ে আছে।

অনেকের ধারণা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রচর্চা শুরু করেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। ১৯৩০ সালে প্রথম তাঁর চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হলেও চিত্রচর্চা ও অনুশীলন চলছিল বহুকাল ধরে, তবে এতকাল এই সমস্ত অনুশীলন লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল। কিন্তু তাঁর চিত্রচর্চার অনুশীলনের সমর্থন পাই তাঁরই বিভিন্ন রচনায় বিচ্ছিন্ন ভাবে। জীবনস্মৃতিতে, আনুমানিক ১৮৮৫ সালে, একটি দিনের স্মৃতি মন্থন করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা।" ১৯০০ সালে জগদীশ বসুর উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে—'শুনে আশ্চর্য হবেন, একখানা Sketch Book নিয়ে বসে ছবি আঁকছি।' (১লা আশ্বিন, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ)। বহুদিন থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর পেনসিল স্কেচ ও কালির দ্বারা অলঙ্করণের উপযোগী কিছু কিছু স্কেচ করেছেন, এই সকল স্কেচকে তিনি এক ধরণের লেজার বই-এ একত্রিত করেন; এই খাতাটি ছিল কালো চামড়ায় সুন্দরভাবে বাঁধাই করা। তিনি ভারতের প্রাচীন রাজপুত ও মোঘল শিল্পীদের আঁকা চিত্রগুলি অধ্যয়ন করেন; ১৯১৩ সালে তিনি প্রকৃতির অনুকরণে কয়েকটি পোর্ট্রেট আঁকেন; ১৯১৫ সালে তিনি গ্রাম ও পল্লীঅঞ্চলের কয়েকটি দৃশ্য অঙ্কন করেন ও প্রাচীন

ভারতের শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন পুঁথি ও পুঁথিকার শ্রেণী বিভাগ সুরু করেন।

১৯১৬ সালে তরুণ শিল্পী ও তাঁর ছাত্র মুকুল দে কে সঙ্গে নিয়ে যান ও জাপানের সেই সময়কার সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী ইওকোইয়ামা তাইকোয়ানের আতিথ্য গ্রহণ করেন। জাপানে অবস্থানকালে সে সকল জাপানী চিত্রশিল্পের বহু নিদর্শন তিনি অবলোকন করেন। তাঁর শিল্প-জনোচিত রুচি ও বিবেক এতই সূক্ষ্ম ছিল যে তিনি ইয়কোহামাতে চৈনিক ও জাপানী চিত্রশিল্পের রীতি ও বিভিন্ন যুগের নিদর্শনগুলি অধ্যয়ন করবার জন্য সেখানে তিন মাস অতিবাহিত করেন।

এর পূর্বে ১৯১২ সালে প্রসিদ্ধ ইংরেজ চিত্রশিল্পী উইলিয়ম রোটেনষ্টাইন-এর সঙ্গে বিলেতে সখ্যতা জন্মে ও জর্ণ, উইগল্যাণ্ড, রোজাঁ, আলবেয়ার বেম্‌নার, বুরদেল—এপষ্টাইন, বোণ, ষ্টার্জ ম্যুর, অর্পেন প্রভৃতির শিল্পকর্ম সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল জাগ্রত হয়। ১৯১৭ সালে জাপান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি শান্তিনিকেতনে কলাভবন (শিল্প বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠার কাজ সুরু করেন। ১৯২০ সালে এই কলাভবনে তিনি একটি প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করেন। এই প্রতিযোগিতায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন ও এর বিচারকও ছিলেন তিনি। দশ বছরের মধ্যে এই বিদ্যালয় অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর পরিচালনায় ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ কলা-বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। কলাভবনে ভারতীয় নবজাগরণের সকল ধারাকেই স্থান দেওয়া হয়েছিল ও সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন শিল্পাঙ্কনের কায়দা সকল সেখানে শিক্ষা দেওয়া হত। প্রাচীর চিত্র অঙ্কনের পদ্ধতিও সেখানে দেওয়া হয়। এখানে একটি গ্রন্থশালা, এমনকি একটি লোক সংস্কৃতির মিউজিয়মও স্থাপিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজে ১৯২৮ সাল থেকে আরও অভিনিবেশ সহকারে চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত হন। তখন থেকে তাঁর রেখাচিত্র স্কেচ ও ছবির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা

সরকারী আর্ট স্কুলে তিনি শিক্ষানবিশি করেন এবং সেখানে গভীর মনোযোগ সহকারে শিল্পের বিভিন্নশাখা অধ্যয়ন করেন। ধীরে ধীরে তিনি তাঁর লেখার কলম ফেলে রেখে শিল্পীর তুলির ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।

উল্লিখিত তথ্যগুলি থেকে এটুকু আমরা বলতে পারি যে, তাঁর চিত্রচর্চা আদৌ কোনো আকস্মিক কিংবা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, যদিও ১৯২৭-২৮ সালের আগে পর্য্যন্ত—রবীন্দ্রনাথ নিজের চিত্রকর্ম সম্পর্কে এক অদ্ভুত দ্বিধা পোষণ করতেন বলেই, হয়ত, এই সুকুমার শিল্পের চর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেননি, এবং এই কারণেই তাঁর চিত্রসৃষ্টিকে কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী-বিভাগের অন্তর্ভূক্ত করা সহজ হলেও তাঁর চিত্রচর্চায় স্পষ্ট কালগত ধারাবাহিকতা—অবনীন্দ্রনাথ, পিকাসো প্রভৃতির চিত্রচর্চায় যা দেখা যায়, তা দেখা যায় না। তাঁর অধিকাংশ চিত্রই ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪১ সাল, রোগশয্যা গ্রহণের মধ্যেবর্ত্তী ক্ষীণ চোদ্দ বৎসরের মধ্যে রচিত।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বহু পূর্ব থেকে চিত্রাঙ্কন সম্পর্কে একটা কৌতূহল বোধ জাগ্রত ছিল, কিন্তু চিত্রশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবার মূল প্রেরণা বোধ করেন লেখাঙ্কনের (Calligraphy) মাধ্যমে। আলোচনার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখাঙ্কনকে (Calligraphy) মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বিমূর্ত অলঙ্করণ সমৃদ্ধ লেখাঙ্কন, চিত্রযুক্ত লেখাঙ্কন ও চিত্র ও অলঙ্করণ-মুক্ত লেখাঙ্কন। রবীন্দ্রনাথের পুর্বে লেখাঙ্কনের সঙ্গে তুলনীয় কোনো লেখাঙ্কন আমরা পাই না। লেখাঙ্কনের ব্যাপক চর্চা চীনে, পারস্যে, মোগল দরবারে, গুজরাতে ধর্মবিষয়ক পুঁথিতে, ওড়িষ্যায় বাংলার পাটায়, পুঁথিতে, দক্ষিণ ভারতে ব্যাপক ভাবে হ'ত! কিন্তু সে সমস্ত লেখাঙ্কন ছিল প্রবুদ্ধ ও পূর্বনিদ্ধারিত। প্রাচীন হস্তলিখিত হিব্রু পুঁথিতে, মিশরের প্রস্তর গাত্রে, আকবরের নির্দেশে রচিত গ্রন্থ সমূহে, চীনের শিল্পীদের কর্মে বিদ্বজ্জন স্বীকৃত লেখাঙ্কনের চরম উৎকর্ষ বিধৃত হয়েছে। নন্দলাল বসুর মতে লেখাঙ্কনের গুণ, 'অক্ষরগুলি স্পষ্ট, সুসমঞ্জস ও মালার

মত শ্রেণীবদ্ধ হবে। পংক্তিগুলি ঋজু ও সমান্তর হবে। অক্ষরগুলি পুষ্ট ও নির্ভীক হবে........সাবলীল স্বাচ্ছন্দ হবে। লেখকের নিজস্ব ধরণ থাকবে, অর্থাৎ লেখকের চরিত্রের ছাপ পড়ে লেখায় একটি চরিত্র ফুটে উঠবে।' লিপি ও হস্তলিপি সম্পূর্ণ বিমূর্ত (Pure abstract) শিল্প— দেশ ভেদে ও গোষ্ঠীভেদে রূপ ভিন্ন—আসল উদ্দেশ্য মনের ভাব লিখিত চিহ্নে প্রকাশ করা। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপিতে লেখাঙ্কনের সব কটি আদর্শ ও গুণ বর্তমান। তৎকালীন কোন বর্তুল বিশিষ্ট বাংলা হস্তাক্ষর রচনার জ্যামিতিক ধরন ভেঙ্গে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একেবারে নূতন ধরনের স্বচ্ছন্দ দ্রুত লিখনের উপযুক্ত অথচ ছন্দোময় হস্তলিপি প্রবর্তন করলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর চীন সম্রাট হুই স্থং-এর অলঙ্করণ বর্জিত সমান্তর, ঋজু পংক্তিতে লেখা কবিতার পাণ্ডুলিপি এবং রবীন্দ্রনাথের স্ফুলিঙ্গ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি একই ধরনের লেখাঙ্কন-কলা। রবীন্দ্রনাথের লেখাঙ্কন কলম দিয়ে রচিত বলে ধাতবগুণ বিশিষ্ট। চীনা ও জাপানি তুলিকা রচিত লেখাঙ্কনের ন্যায় সরু-মোটা টান তাতে অনুপস্থিত। পূর্বে রবীন্দ্রনাথের লেখাঙ্কন যে মোটামুটি তিন ভাগে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে চিত্র ও অলঙ্করণ বর্জন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে উদাহরণ স্বরূপ 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যগ্রন্থের হস্তলিপির কথা বলতে হয়। এতে তিনি হস্তলিপির এক অপূর্ব শৈলীর প্রবর্তন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, বিমূর্ত অলঙ্করণ সমূহ লেখাঙ্কনের ব্যবহার তিনি করেছেন কবিতার পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কাটাকুটির কুশ্রীতাকে সুন্দর রূপ ও তাল মাত্রা ওজনগত মিল দিতে গিয়ে সৃষ্ট বিমূর্ত অলঙ্করণ সমৃদ্ধ লেখাঙ্কন। এই ধরনের লেখাঙ্কন তাঁর বিপুল অথচ সংযত রুচির পরিচয় দেয়। এই ধরনের লেখাঙ্কন সৃষ্টির সময়ই তিনি শেষ বয়সে অবিচ্ছিন্ন চিত্রচর্চায় গভীরভাবে মনোযোগী হন। বিমূর্ত শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ কাণ্ডিনস্কির বক্তব্য—'That is beautiful which is produced by the inner need, which springs from the soul'; উক্তিটিতে যে প্রেরণাকে আধুনিক চিত্রকর্মের নন্দনগতমূল্য ও

সৌকর্যের পক্ষে অপরিহার্য বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের লেখাঙ্কন ও পাণ্ডুলিপি সংশোধনের মধ্যে সেই প্রেরণার প্রতিভাস ও স্পর্শ মেলে। কাটাকুটির কুশ্রীতায় তাঁর চোখে নানারকম নির্বস্তুক বিচ্ছিন্ন রূপাভাস ধরা পড়ত। সেই কুশ্রীতা, সেই বিচ্ছিন্ন রূপাভাস সংহত-সুন্দরের আবেদন তাঁর কাছে উপস্থিত করত। আরো স্বল্প সময়ের ভিতর সংশোধিত, কাটাকুটিবিহীন দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করা সম্ভবপর হলেও, তিনি প্রথম পাণ্ডুলিপির কাটাকুটির অসংবদ্ধ রেখা সমূহকে সংবদ্ধ, সংহত ও সুন্দর রূপ দিতে গিয়ে অনেক সময় কবিতা রচনার চেয়েও বেশী সময় ব্যয় করতেন; যতক্ষণ অভীষ্ট সুন্দর ধরা না দিত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত থামতেন না। নয়ন-শোভন অলঙ্কৃত লেখাঙ্কনের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি পাণ্ডুলিপি সংশোধন করতেন না, পরিমার্জিত পাণ্ডুলিপির কাটাকুটির রেখাসমূহ নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে লেখাঙ্কন হয়ে উঠত। তৃতীয়তঃ চিত্রশোভিত লেখাঙ্কন। এ জাতীয় লেখাঙ্কনে চিত্র বা হস্তলিপি কোনোটাই গৌণ নয়, বরং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল পরস্পর-সম্পৃক্ত। লেখাঙ্কনের পাশে কোন প্রতীকদ্যোতক কিংবা সংশ্লিষ্ট কবিতার ভাববাহক রূপ – পশু, মানুষ বা সাদৃশ্যগত গঠনভঙ্গী— তিনি এই ধরনের লেখাঙ্কন রচনা করতেন। এ ছাড়াও, কেবলমাত্র সংশোধনের খাতিরেই নয়, চিত্রসুলভ স্থান (space) ভরাটের খাতিরেও কখনো কখনো কবিতার পাণ্ডুলিপিতে তিনি চিত্রযোজনা করতেন। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতা, তিনি যখন অসুস্থ হয়ে বিদেশে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর (বিজয়া) বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই সময় রচনা করেন। সেই সময়ে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর ভাষায়, 'making lines that suddenly jumped into life out of this play; prehistoric monsters, birds, faces, appeared'. 'হে মাধবী ভীরু মাধবী দ্বিধা কেন'—গীতিকবিতার পাণ্ডুলিপির লেখাঙ্কনে দেখা যায় যে সেখানে হস্তলিপিকে শাদা অপরিসর স্থানে ছন্দোময় বন্ধনে নিবদ্ধ রেখে বাকি স্থান গাঢ়বর্ণে ঢেকে একপাশে সেই গাঢ়বর্ণের পটভূমিকায়

যে নারী মূর্ত্তি অঙ্কিত, সেই নারীমূর্ত্তির কুসুম-রুচির পবিত্র কোমলতা বিধৃত দেহের শুভ্রতা গাঢ়বর্ণ পটভূমির উপর, অন্ধকারের বুকে প্রথম আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নারীমূর্ত্তির ঋজু দেহভঙ্গীতে পুষ্পদণ্ডের ছন্দ, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত শরীরের মাঝখান দিয়ে নেমে-আসা বক্ররেখায় যেন রহস্যের আভাস। 'অয়ি চিত্রলেখা দেবী ক্ষম মোরে'—লেখাঙ্কন অন্য ধরনের ; উপরে রেখাচিত্র, নীচে সংশোধনহীন মালার মত শ্রেণীবদ্ধ সুসমঞ্জস সমান্তর পংক্তিতে লিখিত। এই লেখাঙ্কনের উপরের রচিত বিনতা নারী-মূর্ত্তির রেখাচিত্রটি নীচের কবিতাটির সঙ্গে রেখা বা বর্ণ দ্বারা সংযুক্ত না হয়েও কবিতাটির মর্ম ও চিত্রটির ভাব উভয়ে উভয়ের সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপন করেছে যার দরুন একে অন্যের নিছক পরিপূরক না হয়ে শরীরের স্বাভাবিক প্রত্যঙ্গের মত অচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে।

এখন প্রশ্ন আসে যে রবীন্দ্রনাথ গভীর মনোনিবেশ সহকারে কোন্ সময় থেকে ছবি আঁকা শুরু করেন। অনেক আগে থেকে মাঝে মাঝে যে খাপছাড়া চেষ্টাগুলি দেখা গেছে সেগুলি বাদ দিয়ে নিজেকে চিত্রশিল্পীর ভূমিকা নিতে দেখা যায় বোধ হয় ১৯২৪ সাল থেকে। যদি পূরবী পাণ্ডুলিপির লেখাঙ্কন ছাড়াও যে সমস্ত অদ্ভুত মূর্তিগুলি আঁকা হয়েছিল সেগুলিকে শুরু হিসাবে ধরা যায় তাহলে ১৯২৪ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম শুরু হিসাবে ধরতে কোন বাধা নেই। চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা ১৯৩০ সালে পাশ্চাত্ত্যে (প্যারিস, বার্লিন, মস্কো, বার্মিংহাম) দেশের সহরে তাঁর চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে, ঐ বৎসর তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্ট বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হন। তিনি Elmhirst সাহেবের সঙ্গে সেখানে অবস্থান করেন এবং সেখানে কয়েক বোতল কালি এবং তুলি Elmhirst সাহেবকে অনুরোধ করে সংগ্রহ করেন। Elmhirst সাহেব সেখানে তাঁকে ছবি আঁকতে দেখেন। কতকগুলি চিত্রতে তারিখ সেই বৎসর রচনা হিসাবে উল্লেখ দেখা যায়। এই সমস্ত চিত্রগুলি সম্পূর্ণ একক ভাবে আঁকা লেখাঙ্কনের সঙ্গে সম্পর্ক-

বিহীন। কিন্তু ১৯২৪ সাল (পূরবী লেখার সময়) থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত কোন চিত্রাঙ্কনের তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় না অথবা এই সময় তাঁকে ছবি আঁকতে দেখছেন বলে কেউ উল্লেখ করেন নি। তাহলে যুক্তি অনুযায়ী ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ১৯২৮ সাল থেকেই তিনি চিত্রচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এটি উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩০ সালে প্রায় ৪০০ চিত্রকর্ম নিয়ে তিনি ইউরোপে আসেন তাঁর চিত্রপ্রদর্শনীর জন্য। উল্লিখিত চিত্রের সংখ্যা দেখে স্বভাবতই মনে আসে যে দেড়বৎসরের মধ্যে এতগুলি ছবি আঁকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল কি না? এ কেবল মাত্র তাই নয়, কিছু খারাপ ছবি কি উল্লিখিত চিত্রের সংখ্যার বাইরে ছিল না? তা হ'লে স্বীকার করে নিতে হয় যে ১৯৩০ সালে জুন মাসের মধ্যে উল্লিখিত চিত্রগুলি তিনি শেষ করেছেন এবং ঐ সমস্ত চিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি বেশ বড় মাপের চিত্র দেখা যায় (৩০"×২৫")। এ ছাড়া তাঁর কর্মপ্রণালী আলোচনা করলে দেখা যায় ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি নানা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন এবং বেশ কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন।

উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে একথা বলা যেতে পারে যে ১৯২৮ সালের পূর্ব থেকেই তাঁর ছবি আঁকার কাজ শুরু হয়, তবে অধিকাংশ চিত্রই তিনি এঁকেছেন ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে। প্রতিমা দেবী উল্লেখ করেছেন যে তিনি চিত্রাঙ্কন কাজ শুরু করেছেন ১৯২৭ সাল থেকে।

যাই হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে চিত্রসাধনা শুরু করেন একথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু এই চিত্রসাধনা কি কেবলমাত্র সময় কাটানোর জন্য ও তৎকালীন রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্য? মণীষী রোমাঁ রোলাঁ অভিযোগ করেছেন তিনি নিজেকে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্য চিত্রাঙ্কনের সাধনা শুরু করেন, অথবা তাঁর লেখনী শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যেতে থাকে সেই কারণে তিনি ছবি আঁকা শুরু করেন। কারও মতে,

তিনি মনে করেন যে কবিতার মাধ্যমে তিনি যে বক্তব্য রাখতে চান তা সম্পূর্ণ নয়, তাই তাঁর চিত্রসাধনা এবং এই চিত্রসাধনায় তাঁর বক্তব্যের সম্পূর্ণতা আনবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু কতগুলি ঘটনাকে সামনে রেখে এগুলি বিচার করা উচিত বলে মনে করি। জীবনের প্রথম দিকে নিজেকে চিত্রশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছেন নানা ভাবে। এছাড়া তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে চিত্রধর্মী। তিনি অবনীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর প্রণিধানযোগ্য উক্তি 'with an envious mood of self-diffidence being thoroughly convinced that my fate had refused me passport across the strict boundaries of letters'; 'জীবন স্মৃতি'তে তিনি শুরু করেছেন, 'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সেই ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোট করে, ছোটকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিষকে পাছে ও পাছের জিনিষকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। বস্তুত, তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।'

রবীন্দ্রনাথ শেষবয়সে যে চিত্রসাধনা শুরু করেছিলেন এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। তার চিত্রকর্ম হয়ত কিছু সমালোচনার অপেক্ষা রাখে, কিন্তু সময় কাটানো, রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা অথবা লেখনী শক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়া তার চিত্রসাধনার ইতিহাস নয়। তিনি চিত্রসাধনা করতে গিয়ে এ বিষয়ে যে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন তা তাঁর কতকগুলি উক্তির মধ্যে প্রকাশ পায়। তাঁর চিত্রসাধনার রূপ কি রকম হওয়া সঙ্গত এ বিষয়ে তিনি যে ঐতিহ্যাশ্রয়ী তা তাঁর বিভিন্ন উক্তির মধ্যে দেখা যাচ্ছে।

'All traditional structures of art must have a sufficient degree of elasticity to allow it to respond to varied impulses of life, delicate or virile ; to grow with its growth, to dance with its rhythm.'

এটা কিন্তু লক্ষ্যনীয় যে তিনি যখন চিত্রসাধনা শুরু করেন তখন তিনি ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেননি ; তার বিভিন্ন প্রতিকৃতি চিত্রগুলি লক্ষ্য করলে কেবলমাত্র একটি প্রতিকৃতির মথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে দেখা যায় যে তিনি অজন্তার স্টাইলে মুখায়বব অঙ্কন করেছেন। তাঁর অপর একটি উক্তিতে দেখা যায়—'I strongly urge our artists vehemently to deny their obligation carefully to produce something that can be labelled as Indian art according to some old world mannerism. Let them proudly refuse to be herded into a pen-like branded beasts that are treated as cattle and not as cows.' ইতিমধ্যে তিনি তার কর্মপ্রণালী স্থির করে নিয়েছেন—'Let us take heart and make daring experiments, venture out into the open road in the face of all risks, go through experiency in the great world of human mind, defying holy prohibitions preached by prudent little critics........ ।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় লেখাঙ্কন ছাড়া অন্যান্য চিত্রকর্মগুলি প্রচলিত ধারাকে পুরোপুরি অনুসরণ করেনি, সেখানে বিচিত্র ধরনের অঙ্কন প্রতিভার আভাস মেলে। তাঁর রচিত নিসর্গ চিত্রে পরিবেশ সৃষ্টির প্রতি এক অদ্ভুত আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। নিসর্গ রচনায় যে সমস্ত বৃক্ষ অঙ্কিত হয়েছে সেগুলি কি জাতীয় বৃক্ষ সেটা বড় কথা নয়, সেখানে কি রেখায় বা বর্ণে রচিত সমস্ত নিসর্গ চিত্রেই

বৃক্ষরাজি নিবিড় ও ঘন ডালে ডাল রেখে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে এবং তারা যে চরিত্রে ও গঠনে বৃক্ষ সেইটেই প্রধান হয়ে উঠেছে। তাঁর বর্ণময় নিসর্গ চিত্রে কোথাও ঘন বনান্তরলবিদারী ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট এক আলোকাভাষ, চিত্রের প্রাণবন্ত কেন্দ্রবিন্দু রূপে, চতুষ্পার্শ্বের গাঢ়-বর্ণের মধ্যে আলোকিত লঘুবর্ণের সংহতি (Balance)—রেমব্রান্ট-অঙ্কিত চিত্রের রোমান্টিক ধর্মের মত উপস্থিত।

চিত্রশিল্প শিক্ষায় ড্রইং সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান—যাকে অ্যাকাডেমিক শিক্ষা বলা যায়, তা আবশ্যক হলেও স্বাধীন শিল্পচর্চায় এবং মহৎ শিল্পীর নিকট চিত্রে মধ্যযুগের উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গীসুলভ যথাযথ হুবহু সাদৃশ্য (photographic quality) বজায়ের রক্ষণশীলতার মূল্য নেই। অনেক শিল্পী ও শিল্প সমালোচক তাঁর ড্রয়িং-এর দুর্বলতার কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন অথচ তাঁরা রবীন্দ্রনাথের চিত্রের ভাবগত মূল্য সম্বন্ধে নিরুচ্চার রয়েছেন। এর পেছনে সমালোচকদের যে মন কাজ করেছে তা হয়ত রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চা গুরু-হীন এবং তথাকথিত অ্যাকাডেমিক শিক্ষা ছিল না বলে মনে হয়। তিনি self-schooled—ভাষা শিক্ষার জন্যও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠেও তাঁর পা পড়েনি। আলোক-চিত্রধর্মী চিত্র অঙ্কন করে তাঁকে যে ড্রয়িং-না-জানার দুর্নাম অপনোদন করতে হবে, এমন দীন মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না। তিনি এ সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন বলেই কি মিউনিকে তিনি বলেছিলেন 'আমার ছবি আমি পশ্চিমকে উপহার দিলাম'। গীয়ম আপলুনেয়ার কিউবিষ্ট শিল্পীদের সপক্ষে বলতে গিয়ে সোজাসুজি বলেছিলেন, 'Real resemblance no longer has any importance, since everything is sacrified by the artist to truth, to the necessities of a higher nature whose existence he assumes, but does not lay bare'.

রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত প্রতিকৃতি চিত্রগুলি লক্ষ করলে দেখা যায় মানুষের

শরীর, মুখায়বে নাক-কান-চোখ-ঠোঁট-হাত-পা-আঙুল-গলা প্রভৃতি গৌণ, অঙ্কিত চরিত্রের ভাবটিই সর্বত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'সে' গ্রন্থে 'পুপে'-শীর্ষক মুখাবয়বটিকে সহজেই মদগলিয়ানির প্রখ্যাত মুখ-চিত্র সমূহের সঙ্গে তুলনা করা চলে। চিত্রটির মুখাবয়বে নিগ্রো ভাস্কর্যসুলভ গঠন অথচ লয় (contour) ও ঘনত্বে কালিঘাটের পটের সঙ্গে আত্মীয়তা। গলার হঠাৎ বাঁকানো ভঙ্গীতে, মুখের কোমল ঢৌলে তরুণীর দৃপ্ত সুষমা চিত্রের একদিক থেকে উঠে উপরে হঠাৎ অবনত হয়ে ঘাড়ের রেখাটি অন্য দিকে নেমে গিয়ে সব মিলিয়ে আপনার উপস্থিতিতে যে ত্রিভুজ রচনা করেছে, তা মুখের ডিম্বাকার আপেলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছে। স্পষ্ট, কোমল ওষ্ঠে মৃদু হাসির স্পর্শ চিত্রের সীমার মধ্যে মুখটি সুন্দর ভাবে সংস্থাপিত।

রবীন্দ্রনাথ রচিত রাজশেখর বসুর মুখাবয়ব, রাজশেখর বসু দেখতে কেমন ছিলেন সে কথা বলে না—অথচ তিনি মানুষটি কেমন ছিলেন, রসময় অথচ গভীর বুদ্ধিদীপ্ত সেই মানুষটির চরিত্র প্রতীতি-ই স্পষ্ট করে তোলে, তেমনি আবার প্যালারামের অপূর্ব মুখ দেখে অবাক হতে হয়। মনে হয় যেন কোনও সতর্ক দ্বাররক্ষী সশঙ্ক প্রহরায় নিযুক্ত। একজন আধুনিক কবি 'প্যালারামের মুখ' চিত্রটির মধ্যে কবিতার উপাদান খুঁজে পেয়েছেন (অরুণ ভট্টাচার্য রচিত 'সমর্পিত শৈশবে'র অন্তর্গত 'রবি ঠাকুরের ছবি' শীর্ষক কবিতার প্রথম স্তবকটি)।

রবীন্দ্রনাথ হুবহু মুখাকৃতি আঁকেননি, মুখের অধিকারীর চরিত্রকে ধরে রাখতে চেয়েছেন। ধ্রুপদী ও মহৎ শিল্পে সাদৃশ্য বা বাস্তবতা বড়ো নয়, চরিত্রের স্পষ্টীকরণই বড়ো। তিনি কোন ধরাবাঁধা আঙ্গিক অনুসরণ করেননি বলেই যে সমস্ত মুখাবয়ব তিনি অঙ্কিত করেছেন তা এতো জোরালো এবং প্রকাশভঙ্গী এমন অবাধ হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ 'খাপছাড়া' ও 'সে' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত চিত্রগুলি সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে। পূর্বেই 'খাপছাড়া'র গ্রন্থে 'প্যালারামের' চিত্র সম্পর্কে উল্লেখ

করা হয়েছে। ঐ দুটি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত চিত্রগুলির মধ্যে শিল্পী মেজাজ প্রত্যক্ষ করি। 'খাপছাড়া'র প্রতিকৃতি সমূহ মোটামুটি ব্যঙ্গার্থক—'সে' গ্রন্থের কিছু সংখ্যক প্রতিকৃতি সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। তিনি এই সব মুখচিত্র নেহাৎই চিত্রণের (illustration) খাতিরে করেননি, এদের উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল। এই সমস্ত মুখচিত্রগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে প্রতিকৃতিগুলি চিত্রিত-সত্যের সীমা পেরিয়ে আমাদের সঠিক চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত করায়। দৃশ্যের চেয়ে অনুভবকে ধরে রাখার খাতিরেই কখনো কখনো জ্যামিতিক রীতিও অনিবার্যভাবে তাঁর মুখাবয়বে এসেছে। এমনকি আত্মপ্রতিকৃতির মত সেন্টিমেণ্টাল মূল্য-বিশিষ্ট চিত্রকেও তিনি রেহাই দেননি ; সাদৃশ্যতার চেয়ে ব্যক্তি-মানসের গুরুত্ব প্রধান—তাঁর মুখাবয়ব অঙ্কনের এই রীতি আত্মপ্রতিকৃতি অঙ্কনের সময়ও স্থির।

রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত জীবজন্তুর চিত্র সম্পর্কেও বলা যায় যে যথাযথ নিখুঁত সাদৃশ্য তা চিত্রে গৌণ হয়ে দেখা দিয়েছে, তাদের চেহারা চিত্রে স্পষ্ট নয়, ভাবরূপটিই স্পষ্ট। এদের শারীর স্থান গঠনেও তিনি একই আদর্শ মেনেছেন। ভাবের আকৃতিকে প্রাধান্য দেওয়ার দরুণ তাঁর এই সকল চিত্রের জীব জানোয়ার স্বচ্ছন্দে আমাদের কল্পনায় বিচরণ করতে পারে। প্রকৃতিকে নকল না করে প্রকৃতিকে তিনি মনের মত করে গড়েছেন। এমনকি, কখনো বিশেষ জান্তব চরিত্র স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি একেবারে অবাস্তব জীব পর্যন্ত অঙ্কন করতে দ্বিধা বোধ করেননি।

স্থির চিত্র (still life) অঙ্কনের সময়ও রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নীতি অর্থাৎ আলোকচিত্রের নীতিকে অনুসরণ করেননি। জড়বস্তুর প্রচলিত রূপকে ভেঙে তিনি পছন্দমত রূপ দিয়েছেন। 'জলপাত্র চলবে কি'—এবং আরও কিছু স্থির চিত্রে পছন্দমত রূপারোপের সুন্দর নিদর্শন দেখা যায়। আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকরগণের স্থির চিত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গী মেলে।

ছন্দোময় মূর্ত ও বিমূর্ত দ্রুত ধাবমান রেখায় বিধৃত গঠনভঙ্গীসমূহ ভারতবর্ষের চিত্রচর্চায় নবীনতম সংযোজন হিসাবেই নয়, আপন বৈশিষ্ট্যের জন্যও স্মরণীয়। এই সকল ভঙ্গীতে রঙের বাহুল্য নেই; নিছক সাদা সমতলে গতিশীল রেখা লয় (contour) অনুযায়ী কোথাও মোটা কোথাও সরু; রেখার প্রস্থ সর্বদা গঠন ও ছন্দকেই অনুসরণ করেনি। তাঁর উক্তি অনুযায়ী 'My pictures are my versification in lines. If, by chance, they are entitled to claim recognition, it must be primarily for some rhythmic significance of form which is ultimate, and not for any interpretation of an idea or representation of a fact'. তাঁর চিত্রের গঠনভঙ্গীতে রেখা ভাবের পরিপূরক বা আধার নয়, ভাবের অনুষঙ্গ হয়ে গতিশীল ছন্দকে বেঁধেছে —'the creative force in the hand of the artist'.

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী কোনো বিশেষ আঙ্গিকে অন্তর্ভুক্ত, এমন দাবি করা যায় না, এমন আঙ্গিকমুক্ত চিত্র সচরাচর দেখা যায় না। চিত্রাঙ্কনের সময়ে যে উপকরণ হাতের কাছে পেয়েছেন তাকেই তিনি কাজে লাগিয়েছেন। কোন নির্দিষ্ট অঙ্কন পদ্ধতিরীতি তিনি অনুসরণ না করার ফলে তার চিত্রসমূহ একঘেয়েমির দোষ থেকে মুক্ত। কোনো আঙ্গিক এবং রীতিনীতির বন্ধনমুক্ত বলেই তাঁর চিত্রের রেখা এমন স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ, বর্ণ দুঃসাহসিক ও অকপট। বর্ণ সম্পর্কে তার ধারণা নূতন এবং নিজস্ব। তার চিত্রে অতিরিক্ত বর্ণ অনুপস্থিত, কোনো সচেতন শিল্পীর মত তিনি উষ্ণ কোমল পর্যায়ের পরস্পরবিরোধী বর্ণ-ব্যবহার কিংবা চিত্রের সমতা (balance) রক্ষার খাতিরে এক বা একাধিক সমধর্মী বর্ণ প্রয়োগ করেন নি। কোনো সংবদ্ধ ভাবনার হুবহু প্রতিরূপ নয়, আঁকতে বসে যা হ'ত—তাই তার রেখা চঞ্চল, গঠনভঙ্গী আলোকচিত্র-সুলভ নয় এবং মনোমত রূপ ধরা না দেওয়া পর্যন্ত হাত অক্লান্ত—'First,

there is the hint of a line, then the lines become a a form. The more pronounced the form becomes the clearer becomes the pictures to my conception. This creation of form is a source of ceaseless wonder.' ১৯৩০ সালের বর্মিংহম মেল্-এ রবীন্দ্রনাথে চিত্রকর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে কেন স্মিথ লিখেছেন, 'We have exquisite handling of line and form in which human figures derive their value as a design, not from direct resemblance to human figures, but rather from the quality of the line by which those figures are expressed'. রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রবলীতে যে বর্ণ সংযোজন করেছেন তা হয়ে উঠেছে মিষ্টিক—রহস্যধর্মী। অরণ্যের নিবিড় ছায়া ইতস্তত প্রলেপে রূপায়িত—এবং ঘন বনান্তরাল ভেদ করে দূরলগ্ন আলোর ক্ষীণ রশ্মি ইত্যাদি রেমব্রাণ্টের চিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে লাল, কালো, ব্রাউন, সবুজ প্রভৃতি পরস্পর আপাত-বিরোধী রঙের যে সহাবস্থান দেখা যায় ও পশুর গায়ে গাঢ় চাপ চাপ বর্ণের অসর্তক প্রয়োগের সাহায্যে আদিম রূপের প্রকাশ, নূতন ধরণের শারীর সংস্থান'—ইত্যাদি লক্ষ্য করে ইউরোপের বিভিন্ন সমালোচক ইউরোপের চিত্রশিল্প জগতে বিভিন্ন এষণার সঙ্গে রবীন্দ্র চিত্রকর্মের আত্মীয়তা বোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত পশুচিত্রের সঙ্গে নরওয়ে দেশের শিল্পী এডওয়ার্ড মুশের, মুখাকৃতির সঙ্গে জর্মানির নল্ডের, এমন কি স্যুর্‌রিয়ালিষ্ট পল্ ক্লীর চিত্রাবলীর সাদৃশ্যতা, ভ্যান গগের ন্যায় বর্ণপ্রয়োগ, ওডিলোন রেডনের ন্যায় macabre fantasy পর্যন্ত আবিষ্কার করেছিলেন। তবু, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলী কোন বিশেষ ধারা বা মতবাদের অন্তর্ভুক্ত নয়—এ এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের চিত্রকর্ম, যার সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়—'It was unique. His art was his very own'; এই নিজস্বতার দরুণ রবীন্দ্রনাথের

বর্ণপ্রকরণ সংস্কারমুক্ত। কালি, জলবর্ণ, পোষ্টার কালার, রঙীন পেন্সিল—সব উপাদান ইচ্ছামত ব্যবহার করেছেন। এমনকি, দ্রুতক্রিয়াশীল মনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষায় তুলি অপারগ মনে হলে চিত্রে সোজাসুজি আঙুলের সাহায্যে বর্ণপ্রয়োগ করেছেন। অনেক সময় হৃদয়-আবেগ ক্ষীণ পেন্সিল সইতে পারতনা বলে ভেঙ্গে যেত। বেশীর ভাগ চিত্র রচনার সময় পূর্বে পেন্সিলের একটা হাল্‌কা খসড়া দিতেন—যার ফলে বর্ণ-প্রয়োগের পরে অদ্ভুত টোন সৃষ্টি হোত। একই চিত্রে পেলিক্যান কালি, জলবর্ণ, পেন্সিলের সহাবস্থানও বিরল নয়। জলবর্ণ এবং এই জাতীয় রাসায়নিক বর্ণ উচিত বর্ণসম্পাতের পক্ষে অপ্রতুল বলে প্রতীয়মান জলে তিনি তাঁর চিত্রে নানারকম ফুলের পাপড়ি, পাতা ঘষে মানানসই টোন্ আনতেন। তৈলচিত্র সুলভ ঔজ্জ্বল্য আরোপ করার মানসে কখনো চিত্রের উপর নারকেল তেল মাখিয়ে রোদে কি ছায়ায় শুকিয়ে পরীক্ষা করতেন। কোন রক্ষনশীল বা পরম্পরাগত সংস্কার তাঁর স্বাধীন চিত্তবৃত্তিকে অবদমিত করে রাখেনি।

রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতকের সৃষ্টি, কিন্তু তাঁর প্রসার বিংশ শতকে। কবি-দার্শনিক রূপে এ যাবৎ পরিচিত রবীন্দ্রনাথ সত্তরের উপান্তে পৌঁছে তার প্রতিভার সবচেয়ে বিস্ময়কর চিহ্ন আমাদের সম্মুখে তুলে ধরলেন। প্রথম প্রকাশেই অবিসংবাদী শিল্পী স্বীকৃতি লাভের ঘটনা বিশ্বে দ্বিতীয়-রহিত। রবীন্দ্রনাথের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সত্তরের উপান্তে এসে তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছিল। তাঁর কবিতা, গান, গদ্যরচনা, চিন্তাধারা এবং মানসিকতা সবকিছুতে এক বিপুল বিপ্লবের স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়। চিন্তা ও মনের চরম প্রান্ত ছুঁয়েছিলেন তিনি, সব নিষ্ঠায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছিলেন,—তাই চিত্রের মাধ্যমে, সে বিষয়ে প্রথাগত শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও, নিজেকে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেলে ধরতে পেরেছিলেন। লীন য়ু টাং-এর মতে কবিতা ও চিত্র একই প্রেরণা-উৎসারিত। প্রি-র‍্যাফায়েলাইট আদর্শে বিশ্বাসী ইউরোপের কবিরা

একাধারে কবি ও শিল্পী ছিলেন ; কাব্যে চিত্রের বর্ণনা, সংহতি ও ধর্ম তাঁরা সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন কবিতার সঙ্গে চিত্রের সম্পর্ক সেই আদিম যুগ থেকে। চিত্রের সঙ্গে কবিতার আত্মীয়তা চিরকালের, কবিতাও চিত্রের মত একটি শিল্প। কবি রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পী রূপে আবির্ভাব বিস্ময়কর মনে হলেও মোটেও অস্বাভাবিক নয়, চিত্রকলাও রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী বিকাশের তেমনি একটি আঙ্গিক, যাকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় না।

জুরিখের ত্রিস্তান ৎসারা ১৯১৬ সালে দাদাইজমের ধুয়া তুলে ধরে ইউরোপের জনসমাজকে বিস্ময়বিমূঢ় করেছিলেন। দাদাইজমের মধ্যেই পরবর্তীকালের স্যুররিয়ালিজমের বীজ নিহিত ছিল। দাদাইষ্টরা সাহিত্য শিল্পে ঐতিহ্যমুক্ত নবতম সৃষ্টির দ্বারা আঙ্গিকের প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এরও পূর্বে ১৯১০ সালে কাণ্ডিন্‌স্কি 'বিশুদ্ধ বিমূর্ত' ('pure abstract') ধারার চিত্র রচনা করে পালাবদলের ইঙ্গিত দেখিয়েছিলেন। দৃশ্যমান জগতকে সমতল আকার ও ঘন বর্ণনা আয়তনের সাহায্যে অঙ্কন করে ফরাসী ইম্প্রেশিনিষ্ট শিল্পী মানেৎ তারও আগে তাঁর চিত্রে বিমূর্ত-শিল্পের পূর্বলক্ষণ প্রকাশ করেছিলেন। দাদাইজম এমন কি পল ক্লী, পিকাসোকেও অনুপ্রাণিত করেছিল এবং পরবর্তিকালে তাঁরা সহজেই স্যুররিয়ালিজম ভাবধারা তাঁদের চিত্রে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। কেবলমাত্র নূতন কিছু করার উৎসাহে ইউরোপের শিল্প সাহিত্যে এত সব আন্দোলন হয়েছিল, মনে করা ভুল,—আত্মপ্রকাশের ইতিপূর্বে অবলম্বিত বিবিধ পরীক্ষিত পন্থা অপ্রতুল ও গ্রহণ-অযোগ্য মনে হওয়ার দরুণ ইউরোপের আধুনিক মানস নবতর আঙ্গিকের সন্ধানে ধাবিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপে (প্যারিস) ১৯৩০ সালে তাঁর চিত্রকর্মের সর্বপ্রথম প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন তখানে স্যুররিয়ালিজমের জোর হাওয়া বইছে। স্যুররিয়ালিজমের প্র-নেতা আঁদ্রে ব্রেঁত নিজে শিল্পী ও কবি ছিলেন। ঘটনা সংযোগে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী সে সময়

হওয়ায় তাঁর প্রধানত বিমূর্ত ছন্দোময় ভঙ্গী ও বর্ণময় মুখাবয়ব চিত্রে ইউরোপের তৎকালীন চিত্রসমালোচক সুররিয়ালিজমের প্রভাব দেখতে পেয়েছিলেন। বার্লিন শহর থেকে প্রকাশিত Vossiche Zeitung পত্রিকায় সমালোচক (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০) Die Brucke গোষ্ঠীর জর্মন এক্সপ্রেসেনিষ্ট শিল্পী নোল্ডে' এডওয়ার্ড মুশ-এর চিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিত্রের মিলের (পূর্বে উল্লেখিত) কথা উল্লেখ করে, পরিশেষে পল ক্লীর (পূর্বে উল্লেখিত) চিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিত্রের 'Free play of humour' এর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।

সুররিয়ালিষ্টরা কোন বস্তুকে হুবহু না দেখে তার ভিতরকার চেহারাকে তারা দেখতে চাইতেন। চিত্রশিল্পের ইতিহাসে সুররিয়ালিজমের দান অসামান্য। অপরদিকে বিংশ শতকে প্রধানত জর্মনীতে এক্সপ্রেশনিজমের উদ্ভব হয়েছিলো। চিত্র দৃশ্যজগতের হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়, এক্সপ্রেশনিষ্টদের মতে চিত্র অন্তরের প্রতিচ্ছায়া—The emphasis on 'inner world of subjective feeling rather than on descriptions of the objective world, usually projective of extreme state of mind' ;—রবীন্দ্রনাথ মিউনিক শহরে বলেছিলেন, 'আমার কবিতা আমার দেশবাসীর জন্য, আমার ছবি আমি পশ্চিমকে উপহার দিলাম'। ইউরোপের সমালোচকবৃন্দ তাই ইউরোপে প্রচলিত চিত্ররীতি খুজতে চেষ্টা করেছিলেন। আসলে চিত্ররীতির বিক্ষিপ্ত মিলের খাতিরে নয়, রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের বিদগ্ধ সমাজের উদ্দেশ্যেই তাঁর চিত্র নিবেদন করেছিলেন। আমেরিকার নু-ইয়র্ক টাইম্‌সের চিত্র সমালোচক রবীন্দ্রনাথের চিত্রে আধুনিক শিল্পীদের ভঙ্গী ফোটাবার চেষ্টাকৃত প্রয়াসের বদলে অবচেতনের শিশুসুলভ সহজ প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন। আমাদের দেশেরও কোন কোন শিল্পী-সমালোচক রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চায় শিশুসুলভ প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্মকে কোন ইজমের অভিধায় চিহ্নিত করার বিপক্ষে ছিলেন, তার মতে,

রবীন্দ্রনাথের চিত্ররীতি তাঁর একান্তই নিজস্ব।

বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর চিত্রকর্মে বিভিন্ন ইজমের প্রচ্ছায়া দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর চিত্ররীতিকে সামগ্রিক পর্যালোচনায় কোন নির্দিষ্ট ছকে ফেলে শেষ কথা বলা উচিত হবে না, কারণ রবীন্দ্রনাথের চিত্ররচনা আঙ্গিকসর্বস্ব নয়। এক্সপ্রেশনিষ্টদের মত তিনি সচেতনভাবে তার চিত্র-রচনা করেননি। এক্সপ্রেশনিষ্টদের সঙ্গে এইখানেই তার পার্থক্য।

স্যুররিয়ালিষ্টদের চিত্ররচনায় প্রতীকের সাহায্যে চিত্রের মৌলভাব প্রকাশ পেত (রেনে মাগ্রিটে, সালভাদোর ডালি প্রভৃতি)। এদের চিত্রে 'চিত্ররচনাকালীন মানসিকতা' সব সময় চিত্রদর্শকের মনে সঞ্চারিত হতে পারত না। নবীন রীতি ও উপস্থাপনার দিকে অতিরিক্ত মনোযোগী হওয়ার ফলে শিল্পীদের রচনা ক্রমে ক্রমে self-centred হয়ে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু স্যুররিয়ালিষ্টদের ভিতর মহৎ উদ্দেশ্য অস্বীকার করা যায় না। তাঁদের চিত্র জগৎ-সংসারের বাস্তবতা থেকে উৎসারিত আংশিক স্বপ্ন, আংশিক কল্পনার সাহায্যে একটি তৃতীয় পথ ধরে চলবার চেষ্টা করেছে। বোধ ও চেতনার অতিরিক্ত অপর একটি বস্তুর অস্তিত্ব অর্থাৎ অবচেতন মনের ক্রিয়া—যার গতি দৃশ্যমানতা ও সম্ভাব্যতার উর্ধ্বে, তাকে স্যুররিয়ালিষ্টরা স্বীকার করেন। স্বপ্নের জগতে দ্রষ্টা একচ্ছত্র অধিপতি, সেখানে প্রকৃতির নিয়ম নির্বাসিত—সব কিছু বদলে গিয়ে স্বপ্নে আবার সব কিছু নূতন আকার নিয়ে, নূতন প্রাণস্পন্দনে সঞ্জীবিত হয়ে উঠে; অবিচ্ছিন্ন গুণের যেমন, তেমনি বাস্তব গুণের ধারণাও স্যুররিয়ালিষ্ট শিল্পীদের পক্ষে অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের কিছু অবয়ব চিত্র যেন স্বপ্নের নিয়মহীন রাজত্ব থেকে আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। মহৎশিল্পে ভাবই মুখ্য রূপারোপ সেখানে হয়ে ওঠে গৌণ। যে শিল্পের ভিতর বস্তুর ভিতরের সত্তাকে উপলব্ধি করা যায় তাকেই মহৎ শিল্পে চিহ্নিত করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের অবয়ব চিত্রে সাদৃশ্য-মানতা প্রত্যক্ষ করতে গেলে হতাশ হতে হবে, অথচ শিল্প সেখানে

কতকগুলি অবিচ্ছিন্ন গুণের সাহায্যে চরিত্র এবং স্বভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যার ফলে তাঁর উল্লিখিত চিত্রগুলি পটভূমির সীমা ছাড়িয়ে আমাদের চেতনা ও অনুভূতির উপর এক প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক চিত্ররীতিতে বিশ্বাসী শিল্পীদের—শিশুদের স্বাভাবিক সরলতার দিকে যে ফিরে যাবার প্রয়াস তারই সার্থক প্রয়োগ পূর্বে উল্লিখিত ন্যু-ইয়র্ক টাইম্‌স্ পত্রিকার কথা সমালোচক রবীন্দ্রনাথের চিত্রসৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন। সুররিয়ালিষ্টরা চিত্রসৃষ্টিতে গৌণ বিষয়ের অবতারণা না করে মুখ্য ও প্রত্যক্ষ বিষয়কে একমেবাদ্বিতীয়ম মেনে তারই পরিপূর্তির প্রতি মনোযোগী হলেন। তেমনি রবীন্দ্রনাথের চিত্ররচনায় সুররিয়া-লিষ্টদের মতই, মূল বক্তব্যের অতিরিক্ত কোনো দ্বিতীয় পর্যায়ের সহযোগী ঘটনার উপস্থিতি নেই। তাঁর এক একটি চিত্র এক একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে রচনা করা হয়েছে—চিত্রের বিস্তৃতি জুড়ে অবস্থান করেছে মূল বিষয়টি। হুবহু জন্তুর চিত্র না এঁকে তিনি এমন সব অদৃষ্টপূর্ব জন্তুর চিত্র এঁকেছেন যাদের মধ্যে জান্তব চরিত্রের ধর্ম উপস্থিত কিন্তু আমাদের কোন পূর্বপুরুষও বিবর্তনের কোনো পর্যায়েও যাদের দেখা পাননি। রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত চিত্রে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেখানে বাস্তব-অবাস্তব-অদ্ভুত-ভাষণ-স্বপ্ন সব মিলিয়ে যেন এক দুর্বার জাদু। সেই সব জন্তু কেবলমাত্র স্বপ্নেই সম্ভব তবু তাদের জান্তব চরিত্রের দরুণ উপস্থিতির সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। স্বপ্নের সঙ্গে বস্তুর সম্মিলন—'The surrealists transcribe a pictorial manner an intermediate state between dream and reality' এবং সন্নিহিতমানতার (close-up) গুণের দরুন রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্মের সঙ্গে সুররিয়ালিষ্টদের সুগভীর আত্মীয়তা অনুভব করা যায়। তাই বলে রবীন্দ্রনাথকে সুররিয়ালিষ্ট আখ্যা দেওয়া সঙ্গত হবে না। কারণ তিনি ভারতশিল্পের ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে শিল্পসৃষ্টি করেননি। প্রাচ্যের দেশজ শিল্পচর্চায় রেখার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

অজন্তা, রাজপুত, কাংড়া, মুঘল, কালিঘাটের পট প্রভৃতি চিত্রসমূহ আলোচনা করলে রেখার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চোখে পড়ে। ভারতের চিত্রকলায় রেখা কখনও ভাববস্তুকে অতিক্রম করে যায়নি, ভাবের অনুষঙ্গ হিসাবে ভাবকে স্পষ্ট করেছে। রেখার প্রতি প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের চিত্রে, বিশেষ করে বিমূর্ত ছন্দোময় ভঙ্গীতে,—প্রবল। প্রচলিত ধর্মের বাহিরে থেকে রেখার তিনি নূতন ধর্ম সৃষ্টি করেছেন। তার চিত্রে তাই দেখতে পাই রেখা কোথাও বক্র, কোথাও জ্যামিতিক, ঋজু বা বিচ্ছিন্ন আবার কোথাও বা গতিময়, শুধু রেখার এবং রেখা ও হালকা বর্ণ সমতলের সহায়তায় এই দুভাবে তিনি বিমূর্ত ছন্দোময় চিত্র রচনা করেছেন। যে সব ক্ষেত্রে সুররিয়ালিষ্টরা প্রতীকের আশ্রয় নিতে চাইতেন রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। সুররিয়ালিষ্টদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এইখানেই।

রবীন্দ্রনাথের চিত্র রোমান্টিক কিন্তু তার প্রয়োগ রীতি সুররিয়ালিষ্টদের থেকে ভিন্ন। 'রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রকৃতিকে ভালোবেসেছেন, তাকে দেখেছেন নানারূপে, জেনেছেন নানা রসে। আকারের অন্তরে যে গোপন বিদেহী সত্তা, তাঁকে তিনি সহজেই ছুঁতে পারতেন।' সুররিয়ালিষ্টদের মধ্যে মূলতঃ দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ধারায় সাদৃশ্যসাপেক্ষ (figurative) ও প্রতীকসাপেক্ষ চিত্র সমালোচকদের ভাষায় হস্তাচিত্রিত স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি হিসাবে বলা হয়েছে ও দ্বিতীয় ধারায় বস্তুনিরপেক্ষ (non-figurative) প্রধানতঃ প্রতীক নির্ভর চিত্রবস্তু। স্বয়ং আঁদ্রে ব্রেত এই রীতিতে চিত্রাঙ্কন করতেন। রবীন্দ্রনাথ সাদৃশ্যসাপেক্ষ অথবা বস্তু-নিরপেক্ষ রীতিতে চিত্র রচনা করেননি। রবীন্দ্রনাথের ছবি দেহের প্রতিকৃতি মাত্র নয়, অমূর্তভাবের দ্যোতক। অনেক শ্রম ও অনুশীলন করে তবেই শিল্পী দেহের অন্তরালে এই বৈদেহীভাবকে অনুভব প্রকাশ করতে পারেন। বস্তুর যে স্বভাব ও আন্তরিক চেহারা আমরা তাঁর চিত্রকর্মে পাই, বাস্তবের সঙ্গে তা সঙ্গতি-সম্পন্ন বলেই তাঁর চিত্র গূঢ় অর্থে বাস্তব।

'স্বভাবকে' অনুকরণ না করে তিনি 'স্বভাব' সৃষ্টি করেছেন। ডালি, আর্ণষ্ট, ক্লী, মিরো, পিকাসো প্রভৃতি শিল্পীরা বাহ্যিক আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং স্যুররিয়ালিষ্ট হওয়া ধর্মান্তর গ্রহণের সামিল। রবীন্দ্রনাথ কোনো বাহ্যিক আন্দোলনে বিচলিত হননি। তাঁর চিত্রে আদিম মানবের সরলতা প্রকাশিত—আদিম বুদ্ধিহীন অসংস্কৃত (raw) গুহা মানবের আদিমতা নয়; সেই আদিমতা পরিশীলিত হয়ে, সংস্কৃত হয়ে নূতনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কোনো সমালোচক রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্মে প্রিমিটিভ আর্টের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। রেড ইণ্ডিয়ান ও প্রি-কলাম্বিয়ান আর্টের সঙ্গে অনেকে সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন। 'পূরবী' এবং 'রক্তকরবী' পাণ্ডুলিপিতে অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে রেড ইণ্ডিয়ান এবং প্রি-কলোম্বিয়ান আর্টের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় বলে মনে করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিত্রে প্রিমিটিভ আর্ট পরিস্ফুটিত না হয়ে তার সরলতা প্রকাশ পেয়েছে; তাতে বুদ্ধি ও চিন্তার যোগ ঘটেছে। তাঁর নিজের ভাষায় 'A sign of greatness in great geniuses is their enormous capacity for borrowing, very often without their knowing of' তাঁর চিত্রে যে আদিমতার গন্ধ আমরা পাই সেটা তার চিত্রকে আরও বলিষ্ঠ করে তুলেছে।

ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্পে যেমন, তেমনি তাঁর চিত্রে বর্ণ ও রেখা পরোক্ষ, অথচ বর্ণ ও রেখার সম্মিলনে ভাবরূপ ও ছন্দ সঞ্চার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য। এদিক দিয়ে বিচার করলে তার শিল্পকর্মে ভারতীয় ঐতিহ্যের নৈকট্য অনুভব করা যায়, কিন্তু তাঁর চিত্র ভারতীয় চিত্রের মিনিয়েচার-ধর্মিতার স্পষ্ট বিরোধ। ভারতীয় চিত্রের দীর্ঘকালের ইতিহাসে মিনিয়েচারের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ মিনিয়েচার ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে, অনর্থক পটভূমির বিস্তৃতিকে সংযত করে চিত্রের চতুঃসীমাকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

সব মিলিয়ে তার চিত্রকলাকে যদি সামগ্রিক ভাবে পর্যালোচনা করি

তা'হলে দেখতে পাব যে তার চিত্রে সরলতা, ঋজুতা ও বক্তব্যের স্পষ্টতা সব মিলিয়ে তিনি এমন একটি রীতি অবলম্বন করেছেন, যা প্রাচ্য হয়েও প্রাচ্য নয়। পাশ্চাত্ত্যের বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্য বলা যাবে না— তা শিল্পীর একান্ত নিজস্ব। অবনীন্দ্রনাথ মনে করতেন, রবীন্দ্রনাথের চিপরীতি এতই স্বতন্ত্র এবং এতই একান্ত নিজস্ব যে, তা কোনো প্রচলিত পরীক্ষিত রীতিতে না-পড়ে নিজেই একটি স্বতন্ত্র একক রীতিরূপে আত্ম-প্রকাশ করেছে। অন্য কোনো শিল্পীর পক্ষে এ রীতিতে প্রবেশ করা অসম্ভব; স্বেচ্ছামূলক ভাবে এ রীতি আয়ত্ত করা যায় না, যেহেতু এ রীতি-তে চেতনার চেয়ে অবচেতনের ভূমিকা প্রধান। রবীন্দ্রনাথ চিত্রচর্চার বাহ্যিক-রীতিতে শিক্ষিত ছিলেন না বলে অন্তরের তাগিদ (urge) ঠেলে বেরিয়ে আত্মপ্রকাশের পথ নিজেই তৈরী করে নিয়েছেন। তাই তাঁর কোন চিত্র ইচ্ছাকৃত বা আয়াসসাপেক্ষ নয়। দর্শকের সঙ্গে চিত্র তথা শিল্পীমানসের সংযোগ স্থাপন, চিত্রের এই সর্বপ্রধান গুণ রবীন্দ্রনাথের চিত্রে প্রত্যক্ষ; আমাদের, তাঁর চিত্র, এমন এক জগতে নিয়ে যায় যেখানে তথাকথিত নিয়মের শাসন নেই, আত্মপ্রকাশের পথে কোনো বাধা নেই, কোনো বর্ণের বিরোধ নেই, অসম্ভব স্বপ্নও যেখানে বাস্তবের স্পর্শে উজ্জীবিত, জীবনের প্রতি যেখানে বিশ্বাস প্রগাঢ়, আনন্দ ও কেন্দ্রবিন্দু থেকে উৎসারিত হয়ে যেখানে যুগপৎ আমাদের আন্দোলিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রেমিক ছিলেন, জীবনপ্রেম ও সৌন্দর্য-প্রেম তাঁর সৃষ্টিতে মজ্জাগত; সৃষ্টির নন্দনগত মূল্যকে তিনি সর্বদা স্বীকার করেছেন। তাঁর চিত্রকর্মে কোনো বাহ্যিক আন্দোলন প্রবিষ্ট হয়নি, তাই তা' বহিরঙ্গ প্রধান নয়। প্যারীতে ১৯৩০ সালে তাঁর প্রথম প্রদর্শনী উপলক্ষে বলেছিলেন, 'ছেলেবেলা থেকে যে একমাত্র শিক্ষা আমি পেয়েছি, তা' হচ্ছে চিন্তা ও সুরের যে ছন্দ, সেই ছন্দের শিক্ষা। তা' থেকে আমি এই কথাটা বুঝেছিলাম যে, যা এলোমেলো যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তার ভিতর একটা পরিপাটি ছন্দ আনতে পারলেই তবে

তার একটা বাস্তব মূল্য হয়—তার বেঁচে থাকার অধিকার জন্মে' ; মনের যে শিক্ষার কথা উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে, সেই শিক্ষাই তাঁর রুচি ও স্বভাব গঠনে সাহায্য করেছে, এবং এই শিক্ষারই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি তার চিত্রের তীব্র সংহতিতে। তাই তিনি নীতি এবং নন্দনতত্ত্বকে অস্বীকার করেননি, তাদের ব্যবহারিক মূল্যের প্রতি তৎপর হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রতি যে অমোঘ আকর্ষণ তাকে জাদু বলা যায়, কিন্তু সে জাদুর উৎস কেবলমাত্র স্বপ্ন বা কল্পনার ভিত্তি ছিল না, বাস্তবের ভিতরেও তার শিকড় প্রসারিত ছিল। তাই তাঁর চিত্রকর্ম magical pictorial incident হয়েও denial of reality হয়ে ওঠেনি। তাঁর ভাষায় 'রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে, তারপর যতই আকার ধারণ করে, ততই সেটা পৌঁছতে থাকে মাথায়। এই রূপসৃষ্টির বিস্ময়ে মন মেতে ওঠে।' চিত্ররচনার পূর্বে চিত্রের বিষয় সম্পর্কে পরিকল্পনার অবকাশ তিনি রাখতেন না। তাঁর কথায় 'যা হয় কোনো একটা রূপ মনের মধ্যে হঠাৎ দেখতে পাই, চারিদিকে কোনো কোনো কিছুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সংলগ্নতা থাক বা না থাক' এই জন্যই তার চিত্র আঙ্গিক সর্বস্ব হয়ে উঠতে পারেনি ; বরং তার চিত্ররীতি স্বয়ং একটি আঙ্গিক হয়ে উঠেছে, এবং বিষয় উপস্থাপনের আশ্চর্য, দ্বিতীয়-রহিত নবীনতা তার চিত্রের প্রসাদ হয়ে উঠেছে।

এ বিষয়ে প্রতিমা দেবীর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য, 'প্যারিসে যখন তাঁর এগজিবিশন হোল, তাঁর মুখেই শুনলুম, পল ভেলেরি, আঁদ্রে জিদ্ ছবি দেখে বলেছিলেন—ডঃ টাগোর, আমরা এখন সবে মাত্র যা ভাবতে শুরু করেছি, আমাদের দেশের এই সব বিচিত্র আর্ট আন্দোলনের তলায় তলায়, যে নূতনকে পাবার চেষ্টা লুকানো রয়েছে, আপনি কি করে এত সহজে সেই জিনিসকে চোখে সামনে এনে ধরলেন ?'

রবীন্দ্রনাথের শিল্পরীতি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিজস্ব, আশ্চর্যরকমের নিরাড়ম্বর, স্বতঃস্ফূর্ত, বাস্তব কোন নিয়মের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্বিকার ;

তাঁর এই নিজস্ব শিল্পরীতি, সকল রকম যুক্তিপ্রয়াস ও প্রকৃতিনিষ্ঠা ব্যতীত যা বোঝা যায় না, যা রহস্যে ঘেরা, যা অস্তিত্বের গহনের ব্যঞ্জনাময় দ্যোতক, উদ্‌ঘাটন যার মধ্যে এবং ব্যক্তিসত্তা ও ব্যক্তিমানসের প্রাধান্য স্বীকৃত, তারই প্রতি অধিকতর আগ্রহশীল। তাঁর শিল্পকর্মের অভিনবত্ব এতই প্রখর (বিশেষ করে যে যুগে এই শিল্পকর্মের আবির্ভাব) যে তার সঙ্গে কোনো কিছুরই তুলনা করা চলে না। তাঁর শিল্পকর্ম যেন শূন্যে বিধৃত, যার সঙ্গে অতীতের কোন যোগ বা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নেই।

প্রকৃতপক্ষে এই শিল্পকর্ম বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যের প্রেমে মগ্ন সৎ, অনুসন্ধিৎসু এবং আদর্শবাদী এক সত্তার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। আজকের দিনে বিভিন্ন আধুনিক তত্ত্বের ও সম্প্রদায়ের দ্বারা যেহেতু আমরা বহুধা বিভক্ত, সেহেতু এই শিল্পকর্মকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে অধিকতর সহজ। তাঁর শিল্পকর্মের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও নৈর্বক্তিকতার সঙ্গে উইলিয়ম ব্লেকের শিল্পকর্মের কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, কেননা এক আপাত সাফল্যের মধ্যে, তাঁর কাব্যে রূপায়িত কবির প্রতীকী কল্পনা ও চিন্তা, এবং তাঁর প্রেমের গভীর তত্ত্ব সূক্ষ্মভাবে তাঁর শিল্পকর্মেও ধরা পড়ে। তাঁর অধিকাংশ চিত্রেরই কোনো শিরোনামা নেই; তাঁর ছবিগুলি সম্পর্কে তিনি নিজে যা বলেছেন ছবিগুলি বাস্তবিকই তাই; ছবিগুলির মধ্যে যা তিনি প্রকাশ করতে চান নি তা অনুসন্ধান করা নিতান্তই অনাবশ্যক, তাঁর ছবিগুলির সুনির্দিষ্ট একটি অর্থ করার প্রয়োজন নেই। কারণ এরকম কোনো অর্থ করতে শিল্পী নিজেই অস্বীকার করেছেন। ছবিগুলি সোজাসুজি 'কতকগুলি স্বপ্ন যাদের অমর করা হয়েছে', ছবিগুলি হয়ে উঠেছে চিত্রায়িত কবিতা। 'যদি দৈবাৎ তারা স্বীকৃতি লাভ করে এবং যদি তাদের মর্ম মর্যাদা পায়, তাহলে তা হবে তাদের ছন্দের জন্য, তাদের কোনো সঠিক অর্থ আছে বলে নয়…তাদের কাজ প্রকাশ করা, ব্যাখ্যা করা নয়, উপরন্তু রহস্য করে তিনি আরও বলেছিলেন 'তার পুষ্পসত্তার দর্শন কি? "এ কথা কি বকুলফুলকে জিজ্ঞাসা করে? যখন

তোমরা বকুল ফুলটি দেখ তখন তোমরা তার সৌন্দর্য্যের দ্বারা আনন্দিত হও। ফুলটির উপস্থিতি এবং তার গুণ থেকেই তোমাদের চিন্ময় ও আনন্দের উদ্ভব, ফুলটির কোন অর্থ থেকে নয়।' তাঁর নিজের শিল্পকর্মের স্ব-কৃত বিচারের সঙ্গে সাধারণভাবে শিল্প সম্পর্কে তাঁর ধারণার সম্পূর্ণ মিল আছে। এই ধারণা আবার ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে, 'শিল্প হচ্ছে মায়া, হয়ে-ওঠার চেষ্টা ছাড়া শিল্পের অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই। এই যে আবির্ভাব, এই যে হয়ে-ওঠার চিরন্তন লীলা তার রহস্যঘন প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে ছন্দ,··যা আছে এবং যা নেই তাদের মধ্যে লুকোচুরি খেলা, বাস্তব ও অবাস্তবের ঝিকিমিকি'।

রবীন্দ্রনাথের অমর্ত্যসম্ভব প্রতিভার শেষতম এবং সেই সঙ্গে বিস্ময়কর উন্মোচন তাঁর আড়াই হাজার সংখ্যক চিত্রকর্ম। তার কথায় 'ছবি হোল আমার শেষ বয়েসের প্রিয়া, তাই নেশার মত আমাকে পেয়ে বসেছে'। এই নেশার ফলশ্রুতিই স্বল্পকালের মধ্যে অঙ্কিত এত বিভিন্ন বিচিত্র ও বিপুল চিত্র। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ জীবনে শেষ প্রান্তে পৌঁছেও একই দিনে একাধিক চিত্র রচনা করেছেন। ১৯৩০ সালে চিত্রকর হিসাবে তাঁর আবির্ভাবের জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না, অনেককেই হতবুদ্ধি করেছিল। কিন্তু আজকের বুদ্ধিমান সমালোচক অন্ততঃ দুটি কারণে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকররূপে আবির্ভাবের প্রযোজনীয়তা ও যৌক্তিকতা স্বীকার করবেন। এক, বেঙ্গল স্কুলের পরগাছারূপী বিকৃত ভাববিলাসকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। দুই, বেঙ্গল স্কুলের পাশাপাশি দেশের আরেক শিল্পীগোষ্ঠী যখন অ্যাকাডেমিক যথাযথবাদের গণ্ডীতে আবদ্ধ, তখন রবীন্দ্রনাথ অ্যাকাডেমিক যথাযথবাদকেই একেবারে অস্বীকার করলেন। তিনিই শিখিয়েছিলেন প্রচলিত সংস্কারের প্রতি অন্ধ ও অর্থহীন শ্রদ্ধা সৃষ্টিশীল শিল্পীর ধর্ম নয়।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

১. যা হাওয়ায় লুটোয়

একদিক হাওয়ায় লুটোচ্ছিল আর একদিক হাসির ভিতরে
হাতঘড়ির মুখ চেয়ে সময় ছুটছে
এত অহঙ্কারী হৃদয় সাদা আংটির কুন্দ কিংবা যূথী
একরাশ কুয়াশা ছড়ালো···
মনে হয় রাত্রি আর নেই অথচ রাত্রিই শুধু আছে
বাইরে খুচরো যাত্রী, যান, নদীপারাপার
চারদিকে গাঢ় অন্ধকার
কত সহজেই তার মধ্যে তীর ছোঁড়া যায়
কেউ জানবে না দেখবে না কোথায় কখন হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল
শুধু একদিন
হাতঘড়ি এগিয়ে দেবে হাত ক্যালেণ্ডারটাকে
ক্যালেণ্ডার যাবে পঞ্জিকায়
তারপর মাস বছর যুগ এবং বিস্মৃতি
স্বপ্নটপ্ন হাওয়ায় লুটোবে।

২. কে আগে পা বাড়াবে

এখানে অতটা গভীর হয়ে না থাকাই ভালো
এখানে জানালাগুলি খোলা
এখানে প্রত্যেকটি চোখের ঠোঁট কুঁকড়ে যায় সাপ হিস্‌হিস্ করে
ছায়া কিংবা বিশাল আকাশ নরনারীশ্রেণী নিশ্চয় নৈঃসঙ্গ্য দেবে

সেখানে কোথাও একটু হাতের উত্তাপ
চোখের দিঘির পাশে পাশে
একটি হাঁসের মতন জলে মুখ দেখতে দেখতে
দার্শনিক ডুব দিয়ে মণিমুক্তা তুলে আনা যায়
সেখানে এখন যেতে হবে
কে আগে বাড়াবে পা
তুমি, আমি, জোড়-পা দুজন ?

৩. কোথায় সীমানা

আর একবার হাওয়া চাই সারাদিন
বুকের ফুসফুস দুটো ফাঁকা ফাঁপা সহজ হয়ে উঠুক
রাস্তার লালফুলগুলো এক পশলা বৃষ্টিতে এখন
ঝরঝরে পরিষ্কার হয়ে যাক
হাঁটুজল বাঁচিয়ে আমরা পায়রা-ছাদের নীচে দাঁড়াই
তোমার হাতের কঙ্কণে গাল রাখতে ইচ্ছে করে
সুন্দর গলার গভীরতায় ডুবে যেতে ভাল লাগে
দিন ফুরোবার আগে এখনো দিনের হাওয়ায়
তোমার ওড়া চুলের উত্তাল ভাষার ভিতরে
আমার শুধুই বোবা দৃষ্টি····

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

১. স্বর্গ দিলি নে

তখন ডাকলে ছিল আনত স্বীকৃতি
—ডাকলি নে।
তখন নয়ন ছুঁলে স্বর্গ পেতাম
—তুই স্বর্গ দিলি নে।

হেঁটে গেলে পিছনে বাতাস ছুটে গেছে
কেঁপেছি সভয়ে
তখন নিঃশ্বাসে তোর পারুল বকুল
তুই বুঝলি নে।

তখন আঙুলে তুই জপমালা
বিশাল দুপুরজুড়ে শুধু তুই শুধু তুই ছিলি
চোখ তুললি নে।
সমস্ত আকাশে স্থির একটি নক্ষত্র ছিলি
জানলি নে।

এখন মধ্যাহ্নলাশ ঝুলে আছে ছাতিম চূড়ায়
রক্তহীন জারুলের ডালে অন্ধকার মুখ গুঁজে—
পাহাড়তলীতে নাচ হয়ে গেছে ;
পাহাড়তলীতে নাচ হয়ে গেলে যে যার আশ্রয়ে ফিরে যায়,
যে যাকে পেয়েছে তাকে নিয়ে

যে যার স্বর্গের বাড়ি চলে গেছে
তখন নয়ন ছুঁলে স্বর্গ পেতাম
তুই স্বর্গ দিলি নে।

২. তুমি তা জানো না

জানি তুমি অহংকারী নও
তবু কঠিন আয়াসে স্বর তীক্ষ্ণ করে রাখো,
আঁকো ললাটে ভ্রূকুটি। দেখে দুঃখ পাই।
ব্যস্ততা থাকে না তবু কঠিন কৌশলে তুমি
আঙুলে দু'চোখে সুস্থ শরীর কাঁপিয়ে কথা বলো ;

জানি তুমি অহংকারী নও।
তবু কেন কঠিন আয়াসে ঢেকে রাখো
একান্ত নিজেকে কেন দুঃখ দাও, কেন দুঃখ পাও !

লোভী হয়ে ছুটে ছুটে যাই, দেখে আসি
আয়াসের অন্তরালে চোখ রাখি,
দেখি শান্ত দেবশিশু ডুকরে কাঁদে তোমার শরীরে
সেখানে ভ্রূকুটি নেই, নির্মম ব্যস্ততা নেই কপট ভঙ্গিমা
—না, কিছু না।
কোমল অমল তুমি বুক খুলে বসে আছো।

লোভী হয়ে ছুটে ছুটে যাই
তোমার আড়ালে 'তুমি' দেখে আসি
তুমি তা জানো না।

মানস রায়চৌধুরী

প্রহরী

১. নোনা জলে ধুয়ে যায় স্মৃতির মুকুর
গ্রামের ভিতর দিয়ে বালিয়াড়ি পার হয়ে
ছুটে যাই সমুদ্রের পাড়ে
যেখানে অনন্ত বালুরেখা ঢেউ আর নুন।
অনর্গল চেয়ে থেকে মনে পড়ে যায়
পিছনে ঘুমন্ত আজো গ্রামের মানুষ
দুঃস্বপ্ন পাখায় ওড়ে
ঘাসের ভিতর দিয়ে বয়ে যায় মরণের ছায়া।

আকাশ, সবুজ মাঠ,
চাবুক নিষ্ঠুর চাকা
ছুরি ও ঘুঙুর
ঝোপের মাঝখানে সাদা মাটি ও বালির স্রোত
গাছের পাতায়
সবুজ শূন্যতা সে-ও অসীম নিদ্রায়
নিরন্ন মানুষ আর কৃষকের স্বেদসিক্ত বিছানায়
দেহাতি সংলাপ
তা-ও দেখি খেজুর রসের স্রোতে দীর্ঘ ঘুমে ডোবে।
এত পথ ঘুরে ঘুরে আমি এই সমুদ্রের তীরে
এসে ঠিক বসেছি টিলায়
যেন খুব দুঃখ, যেন তোমাদের বুকের মাঝখানে
জেগে আছি আড়াআড়ি
সব কিছু লক্ষ্য করি পৃথিবীর অমর প্রহরী।

২. বৃক্ষের মতই আমি অনুভব করি
ডালপালা দিয়ে আরও প্রোথিত শিকড়ে
মাটির উদর ফুঁড়ে অনুভব করি।
কিন্তু ঐ পাথরকে ঈর্ষা হয় মনে
যার কোনো আর্দ্রতার অনুভব নেই
কেন না সে বুঝেছিলো
অস্তিত্বের চেয়ে বেশি
অশ্রুভরা অনুভব নেই।
বেঁচে থাকা অশ্রুর সোদর
কিছুই জানেনি তবু দিক্‌চিহ্নহারা
জীবনের পাখা খুলে যে পাখীরা উড়ে গেছে
তাদের আকাশ আমি দুঃখ দিয়ে চিনি
ভয় পাই হয়তো আগামীকালে মৃত্যু আছে গূঢ়
যেমন আলোর পাশে ছায়া মাখামাখি
মাংসে থাকে হাড়ের তীক্ষ্ণতা
জলের ভিতরে বাজে বালুকার সূক্ষ্ম স্বরলিপি
"কথা দাও কথা দাও" বলে নামে অপার শূন্যতা

গাছ নয় পাথরের মতো এক অস্তিত্ব চেয়েছি হাঁটু গেড়ে।

গম্ভীরা গানে সমাজ-চেতনা

গম্ভীরা মালদহের গম্ভীরা। চৈত্রমাসে শিবের গাজন উপলক্ষ্য করে যে উৎসব ও সঙ্গীতের আয়োজন হয়, শুধু সঙ্গীত বললে ভুল হবে গম্ভীরার মুখোস নৃত্যও আছে, এক কথায় তাকে গম্ভীরা বলা হয়ে থাকে। মালদহের গম্ভীরা শিবোৎসব। গম্ভীরা লোক-উৎসব। গম্ভীরা লোক সংগীত।

আমরা এখানে 'গম্ভীরা'র সামগ্রিক আলোচনার দিকে না গিয়ে বরং গম্ভীরাগান নিয়েই কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করব। আজকালকার গম্ভীরায় যাত্রার ঢঙ্। যে স্থানে গম্ভীরা গান হয় সেই স্থানটি গোল বা চৌকো করে ছেড়ে গোল হয়ে বসে দর্শকেরা। কিছু দূরে থাকে সাজঘর। মধ্যেকার খালি অংশ থেকে সাজঘর পর্যন্ত সরু অথচ কিছুটা বক্র পথ থাকে। আসরের খালি অংশটুকু বাদ দিয়ে দর্শকদের কোল ঘেঁসে বসে দোহারেরা বাদকেরা। গম্ভীরা গানে কয়েকটি অংশ থাকে বন্দনা, ঠুংকি, চার ইয়ারী, রিপোর্ট ইত্যাদি। বন্দনা অংশে মহাদেব সেজে একজন আসরে প্রবেশ করেন। তিনি যেন সরকারের প্রতিনিধি রাষ্ট্রনিয়ন্তা। অন্য চরিত্ররা আসে সাধারণ গরীব ও গ্রামীণ চাষীর ভূমিকায়। তাদের পোষাক থাকে মলিন ও ছিন্ন দরিদ্র কৃষকের প্রতীক। দারিদ্র্য-পীড়িত জনগণের প্রতীক। সরকারের দরবারে দরিদ্র মানুষের হয়ে নালিশ জানায় তারা। অনুযোগ করে শিবকে উদ্দেশ্য করে। শিব প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে অন্তর্ধান করেন।

এরপর নানা বিষয় নিয়ে চলে গম্ভীরা গান। এক একটী গম্ভীরা অনুষ্ঠানে কম করে ৫।৬টি বিষয়বস্তু থাকে। ২।৩ ঘণ্টা সময় লাগে পরিবেশনে। সমসাময়িক যে কোন সমস্যার বিষয়ীভূত হতে পারে। রাজনীতি, দুর্নীতি, সমাজনীতি, কৃষি শিক্ষা ইত্যাদি তাবৎ বিষয়ের উপর।

অভিনেতাদের একজন ছিন্নবস্ত্রে আসবে, সে দরিদ্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে। তার বক্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্পষ্ট কিন্তু কৌতুক রসের মোড়কে ঢাকা। হাস্যরসের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপিত করে পাত্র পাত্রীরা, কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে জীবনের বাস্তব সত্য যা মানুষের মনকে নাড়া দেয়।

গম্ভীরা গানে মহিলা শিল্পীর প্রবেশ দেখা যায় না। পুরুষ শিল্পীরা মহিলা চরিত্রের বেশ গ্রহণ করে। 'চার ইয়ার' অংশে চারজন বক্তব্য রাখে। এখানে বৈঠকী ঢঙে সংলাপ চলে। গম্ভীরা গানে দলমত নিরপেক্ষ ভাবে সকল অন্যায় ও অবিচারের কঠোর সমালোচনা করা হয়ে থাকে।

গম্ভীরা গানের শেষ অংশে 'খবর' বা 'রিপোর্ট'। একটি বিশেষ এলাকার জনগণের নতুন খবর রিপোর্ট অংশে পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সুরে গম্ভীরা গান গাওয়া হয়ে থাকে। গানগুলিতে ঝাঁপতাল, একতাল, খেমটা যেমন থাকে, তেমনি থাকে কীর্তন, জারি, বাউল, রামপ্রসাদী প্রভৃতি গানের মিশ্রিত সুর। গম্ভীরা গানের বক্তব্য গ্রাম্য-সুরে ও মালদহের নিজস্ব গ্রাম্য ভাষায় এমনভাবে পরিবেশন করা হয় যে তা থেকে গ্রামীণ মানুষেরা বহুবিধ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাই মালদহের গম্ভীরা নিছক একটি উৎসবের গান নয়, এটি একাধারে উৎসব এবং লোকশিক্ষারও বড় মাধ্যম। গম্ভীরা গান নৃত্য গীত, বাদ্য ও সংলাপ সহ পরিবেশিত হয়। এটি লোক-শিক্ষা ও লোকরঞ্জনের একটি শক্তিশালী ও জনপ্রিয় মাধ্যম।

গম্ভীরা গান ধর্মের গান নয়। নির্ভেজাল প্রেম বা রোমান্সের গানও নয়। গম্ভীরা গান জীবন-যন্ত্রণার গান, মাটির মানুষের আশা, আকাংক্ষা, ব্যর্থতা ও সংগ্রামের গান। ধর্ম, সমাজ, পারিবারিক ঘটনা, রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, কুশাসন, কুসংস্কার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে রচিত গম্ভীরা গান নিরক্ষর গ্রাম্য জীবনে বিভিন্ন চিন্তাধারার বিচিত্র প্রকাশ।

গোড়ার দিকে ধর্মরাজ পুজোর সঙ্গে শিবপুজো তথা গম্ভীরার হয়তো কিছুটা একাত্মতা ছিল। কালক্রমে জলবন্দনা থেকে কৃষিতত্ত্ব হয়ে বর্তমানে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়েছে। গ্রামজীবন এর সঙ্গে কৃষিজীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই কৃষকজীবনের সুখ, দুঃখ, আশা আকাংক্ষাই এককালে হয়ত গম্ভীরা গানে প্রধান অংশ রূপে থাকত।

যদিও বর্তমানে যাত্রার আসরের মত যে কোন দিন যে কোন স্থানে গম্ভীরা হতে পারে। আগে কিন্তু গম্ভীরা গানের নির্দিষ্ট সময় ও স্থান ছিল। গম্ভীরা তথা গাজন উৎসবের সময় গম্ভীরা মণ্ডপে গম্ভীরা গান হত। উৎসব ও গান একাত্ম ছিল। মালদহের ভোলাহাট, আইহো, কুতুবপুর, ধানতলা, মহেশপুর, সাহাপুর, মঙ্গলবাড়ী, গণিপুর, জোত-আরাপুর, কাশীমপুর, কোতয়ালী, মহন্দাপুর প্রভৃতি স্থান এককালে গম্ভীরা উৎসবের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভোলাহাট বর্তমানে বাংলাদেশে।

সেকালে পদ্মফুল, ঘিয়ের প্রদীপ, মশাল, কাগজের ফুল, মালা, কাগজের পাখি, মাটির পরী, মাটির পুতুল প্রভৃতি দিয়ে মণ্ডপ সাজান হত। মাথায় থাকত চাঁদোয়া, মৃত্তিকারচিত রামকেলী দিয়ে মণ্ডপ শোভা পেত। আর টাঙান থাকত বিভিন্ন পট ও ছবি। সুতরাং গম্ভীরা উৎসব এর সঙ্গে নৃত্য, গীত, লোক শিল্পের সংমিশ্রণ ঘটত। তাই এই উৎসব গ্রামীণ সংস্কৃতির আশ্চর্য মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠত। এখন গম্ভীরা মণ্ডপের সে জৌলুস নাই।

সেকালের মালদহে প্রতি গ্রামের দলপতি 'মণ্ডল' নামে অবিহিত হতেন। তাদের অধীনে থাকত এক-একটি 'মণ্ডপ' সে সব মণ্ডপ জমিদারের আয়ে চলত কোথাও কোথাও। জনসাধারণেরও চাঁদাতে চলত। বর্তমানে মণ্ডপ প্রধানের অধীনে মণ্ডপ-প্রথা নাই।

গম্ভীরা উৎসব ও কৃষি যেন একাত্ম। যেমন 'ঘটভরা' অনুষ্ঠান ঘটভরা ফুলভাঙ্গা, মশাল নাচা, আহারা বোলাই, সামাশাল ছাড়া ঢেঁকি-মঙ্গলা,

প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সংস্কার, আদিম বিশ্বাস, কৃষি-ব্যবস্থা, জেলেদের জীবন এর সঙ্গে এই অনুষ্ঠানগুলির নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

গ্রাম-জীবনের ছোট ছোট সুখ, দুঃখ, ব্যথা বেদনার প্রবহমান ধারার সঙ্গে এই সঙ্গীত এর প্রবাহ একাত্ম হয়ে বৎসরের পর বৎসর লোক জীবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলছে। তাই এই গান লৌকিক জীবনের গান। এই গানে লৌকিক শিল্প, নৃত্য, বাদ্য, ও গীত এর বিচিত্র ধারার সম্মিলন হয়েছে। লোক-জীবনের সঙ্গে এই গান অবিচ্ছিন্ন থাকায় এই গানে গ্রামীণ জীবনের সহজ ও সরল প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে যা নগরজীবন থেকে অবশ্যই স্বতন্ত্র ধরনের।

এককালে ধর্মকে কেন্দ্র করে গম্ভীরাগানের জন্ম হলেও পূর্বেকার গণ্ডী অতিক্রম করে অনায়াসে বৃহত্তর সমাজ চৈতন্যের প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রবেশ লাভ করেছে। এখানে আছে মালদহের মাটির গন্ধ ও আকর্ষণ। স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত গ্রাম্য কবিদের সৃজনশীল প্রতিভার যাদুস্পর্শ। সাহিত্যমূল্য কম হলেও হৃদয়ের উত্তাপে তা পরিপুষ্ট।

গ্রামের সাধারণ মানুষেরা অধিকাংশ নিরক্ষর। তারা দেশের হালচাল খবরাখবর, সংবাদপত্র মারফৎ গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু তারা আগ্রহী। তাদের সেই আগ্রহকে পরিপুষ্ট করেছে—তাদের উপযোগী করে লোক-নাট্যের আঙ্গিকে গম্ভীরা গান পরিবেশন করে গম্ভীরা শিল্পীরা এক বিরাট লোক-শিক্ষা প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

গত বছর কলকাতায় পূর্বভারত সংস্কৃতি সম্মেলনে মালদহের হাটখোলার বিশু পণ্ডিতের দলের গম্ভীরা পরিবেশিত হয়। তারই অংশ—শিব-বন্দনা। এই বন্দনাটি মালদহ থেকে এই গানের রচয়িতা শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস এর কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

শিব-বন্দনা

১. মোদের বান্ধাছ যেগুলি ভুলি কেমনে ভুলতে পারিনা—হে নানা
ছাইড়া দে ঢং বাজার পাখ্না।

আছ জেগে কে-যোগে রেগে কে ভোগে কেছু বুঝতে পারি না
কথা শুন খুইল্যা কানের ঢাকনা ।

২. খনন যেমন পুনর্বাসন সুখের যত রাস্তা তুমি
অবহেলে দিচ্ছ ঠেলে কোটি কোটি বস্তা হে
বেকারের কাজ দেবার তরে লেগাছ যেন উঠে পরে
কত খুলছ কল-কারখানা রাস্তা ঘাটের নাই ঠিকানা (কিন্তু)
গণতন্ত্রের মামুলী দুর্নীতির চোটে চৌচির হয়ে গিয়েছে ফেটে
মোরা হনু তুলা ধুনা তোমার পোষা ভূতের দানে সুখ আর
সহেনা—হে নানা

* * *

৩. চাষীদের ডাকে সারা দেলে হে দরদী—তাই
লোনে, বীজ, সার রক্ষা করছ চাষী জাতি হে—
জংগল কাইটা করছ আবাদ ঘুচাইতে হার খাদ্যের অভাব
ভাত জুটাতে সরকারী ডিপার্টমেণ্ট রয়েছে ফিসারী
(তবে) ফলাইছ ফসল যত কাগজে কলমে তবু প্যাটের আগুন
নেভে না কেনে ?

৪. আর যোগাসনে বসে কেনে ওহে মহাযোগী
দিনে দিনে হলে তুমি ক্যানসার রোগের রোগী হে—
মিল মালিক আর মজুতদার কালোবাজারী সাথে করে
চোর জুয়াচোর আরো জালিয়াৎ ঘুষখোরেরা লুঠছে দিনরাত
দ্যাশের দুশমন সব একসাথে মিলে দেয়, স্বার্থের হাঁড়ি কাঠে
মানবতার বলি
চাহ তুমি তিন চোখ খুলে নইলে আমরা বাঁচব না—হে নানা ।
দাস উপেনের এই ত বাসনা ।

এই গানের কোন কথায় অস্পষ্টতা নাই। সবই সাধারণ মানুষের

সাধারণ কথা। মনের কথা যেন ভাষায় গানে ভঙ্গিতে অবিকল প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ মানুষ বলি বলি করে ভাষার অভাবে যা বলতে পারছিল না গম্ভীরা গানের শিল্পীরা যেন তাদের অন্তরের ভাষাই তাদের হয়ে বলেছেন—"তবু প্যাটের আগুন নেভে না কে-নে ?" —এটাইত গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রশ্ন—"প্যাটের আগুন নেভে না কে-নে ?"

১৯৭১ ডিসেম্বর এর বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামের উত্তালতরঙ্গ মালদহের গ্রাম প্রান্তেও আছড়ে পড়েছিল। মালদহের এক অংশ পূর্ব বাংলায় পড়েছে। সীমান্ত কাছেই। যুদ্ধের সময় অসংখ্য উদ্বাস্তুকে মালদহবাসীরা তাদের সাধ্যমত আশ্রয় দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেয়েছেন—তাই সঙ্গত কারণে মালদহের গম্ভীরা গানেও তার প্রভাব পড়েছে।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার এর প্রতিষ্ঠাতে সাধারণ মানুষের বিপুল সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। সেই কথা সেবারের একটি গম্ভীরা গানে ফুটে উঠেছে :—

পশ্চিমবাংলা বাসী হয়েছে খুশী
দেখে অকংগ্রেসী সংকার গঠন ॥
রাখি মোরা আশা পাব ভালবাসা
অচিরে হবে সব দুঃখ মোচন।
সোনার বাংলা গরীব চাষী
সবার মুখে ফুটছে হাসি
সবাই আমরা আজ মিলে মিশে
জানাই তোমাদের অভিনন্দন
ঘুষ, দুর্নীতি আর খাদ্যনীতি
ধীরে ধীরে এদের কর সদগতি
চোরা কারবারী পুঁজিপতি
ধরে এদের কর নিধন।

স্বার্থ-বাদী আর কয়েদীদল
মিলে মিশে তারা সকল
ভবিষ্যতে যেন না করে অটল
অটল থেকে রেখো কড়া নয়ন।

কিন্তু যুক্তফ্রন্ট শাসনের কয়েকমাস পরে গম্ভীরা গানের লোক-শিল্পীদের মুখ দিয়ে গণ-মানসের অনুযোগ প্রকাশ পেয়েছে :

অজয় মুখার্জী ও জ্যোতি বসুর নিকট চাষীর আক্ষেপ

ধুয়া বলতে কথা লাগছে ব্যথা
বলিতে মুখ ফোটে না
নানা মুনির নানা মত শুনিয়া এখন
হলাম আমচুরা।

১. দশ মাস পেয়ে তোরা বাংলার শাসন
রঙ বেরঙের কত ঝাড়লী গাজন হে
নেতা—
৪০ ডিগ্রী খেড়ে গেল তোদের
কর্মীগণ মেজাজ দেখায়—
সহরময় গাঁয়ে—
কথা বল্লি দেমাকে চালে।
দেশের যত ছিল গরীব জনগন
গঙ্গাজলে পবিত্র করে মন হে নেতা
তোদের উপর আস্থা রেখেছিল আস্থা
সুখী হবে সবাই খেয়ে পড়ে
কালবৈশাখী দিল ফাঁকি
করে দিল মোদের তুলোধুনা।

আর একটি গম্ভীরা গান :—

অজয় মুখার্জী ও জ্যোতি বসুর প্রতি

(ভেবেছিলাম) থাকবো সুখে মরবো না দুঃখে
ফ্রণ্ট সরকারের আমলে
অশ্রুধারা মুছিয়ে দিবে ঘুচিয়ে
পরবো না ধনীর কবলে।
চোদ্দ শরীক সদাই করে কথার কাটাকাটি
দরকার হলে দলে দলে করে লাঠালাঠি
দেশের করবে কি কাজ ভেবে পাই না আজ
কালি চুন লাগল গালে
সংবিধান বিধান করে যদি আইন করতা
জমি খাস vest বেনামী সেই সূত্রে নেতা
হত না খুন জখম উৎপীড়ন
মরতো না সাপের ছোবলে।

কৌতুক ও ব্যঙ্গরসের মোড়কে জীবনের রূঢ় সত্য, সমাজ ও রাজনীতির অপদার্থতার খোলস খুলে ফেলা হয়। মটুরী ওরফে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী মালদহের একজন প্রখ্যাত গম্ভীরা শিল্পী। তিনি গম্ভীরা গানের দল নিয়ে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা, বিহার, আসাম, নেপাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তবে দলের গান রচনা করেন সাধারণত মালদহের শ্রীদুকড়ি চৌধুরী। মটরার আসরে হাজার হাজার শ্রোতার সমাবেশ হয়। মটরা স্বয়ং সাধারণ মানুষ ও উচিৎ বক্তার ভূমিকায় আসরে অবতীর্ণ হয়ে, কৌতুক, ব্যঙ্গ, নৃত্য, গীত, কণ্ঠের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন ভঙ্গিমা দিয়ে হাজার হাজার জনচিত্ত জয় করেছেন। তার বক্তব্যে থাকে সাধারণ মানুষের মনের কথা। আর যতো অন্যায় ও অবিচারের প্রতি তীব্র কষাঘাত। নির্ভীক ও মুক্তকণ্ঠ এই শিল্পী গম্ভীরা গানের এক আশ্চর্য প্রতিভা। মটরার দলের একটি বন্দনা :—

১. যে দেশেতে সোয়া প্রহর
স্বর্ণবৃষ্টি হয়—
সে দেশের লোক কি কারণে
অন্নকষ্ট পায় হে—
খরা নিবারণের তরে
কতই নলকূপ খনন করে
তবুও জলের অভাব মেটে না
মোড়লি মারতে কেউ তো ছাড়ে না।

* * *

২. পূর্বের জমিদার জোতদার ছিল যারা
তারা রাখতো গোচর ভূমি
তুমি সেই সব জায়গা আবাদ করে
করলে ফসলি জমি হে—
শ্মশান গোরস্থান যতই ছিল—
সবই বন্দোবস্ত হলো
তবুও খাদ্যের অভাব মেটে না
শুন হে ভোলানাথ
তুমি খেয়ে সিদ্ধি আঁটছো বুদ্ধি
মারছো পেটের ভাত ॥

৩. নাইকো হাল রোজগার সবাই বেকার
হলাম এক গোয়ালের গরু
তুমি ভালই আছ, ভালই খাচ্ছ
সেজে কল্পতরু
ভুট্টো করছেন শীর্ষ সম্মেলন
তোমায় জানিয়েছেন আমন্ত্রণ
হাত বাড়িয়ে চাইছেন আমন্ত্রণ

তলে তলে যোগাচ্ছেন ইন্ধন
তার সাথে কোন মতে
মিলাও না হাত
শেষে দেবে যে আঘাত।

বন্দনা গানে দেশের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেকার জমিদারদের জমি সংক্রান্ত ব্যবস্থা, বর্তমান ভূমি ব্যবস্থার হাল 'বেকার সমস্যা, ভুট্টোর শীর্ষ সম্মেলন থেকে আরম্ভ করে শেষে দেবে যে আঘাত' এর মত সাবধান বাণী উচ্চারণ করতেও লোককবি ভুলে যাননি।

পরিশেষে ঐ বন্দনাতেই আছে :

দেশের শান্তি সংহতি
চাই উমাপতি
করি প্রণিপাত
হাবলের এইতো প্রণিপাত।

গম্ভীরা গানের কি বিপুল ক্ষমতা তা ইংরেজ আমলে উপলব্ধি করেছিল ইংরেজ সরকার। ১৩৪৪-৪৫ খৃঃ মালদহের তৎকালীন জেলাশাসক গম্ভীরার বিপুল জনপ্রিয়তা এবং গম্ভীরা শিল্পীদের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে সোচ্চার ঘোষণা হয়েছিল তা লক্ষ্য করে সেকালের গম্ভীরা কবি গোবিন্দলাল, গোবিন্দ শেঠ ও মটরাকে (শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী) গ্রেপ্তার করেন। রাজরোষে পড়েও গম্ভীরা দলগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে চলেন। গম্ভীরা গানের মাধ্যমে গ্রামের হাজারো মানুষ রাজনীতি সচেতন হবার সুযোগ পান। ব্যঙ্গ শ্লেষ ও হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে রাজনীতির বিবরগুলি গ্রামের অশিক্ষিত মনে সহজে দাগ কাটে। গম্ভীরার গানে শুধু যে দেশজ রাজনীতির বিষয় জানে তা নয় আজকাল বিশ্বরাজনীতির অনেক ঘটনাই গম্ভীরা গানে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

যেমন—'টন্‌টু' শীর্ষক গম্ভীরা গানে (নিক্সন ও চু-এন-লাই এর প্রতি):

খেয়ে ঠেকা সেজে বোকা
জোড়া ভাইরা ভাই
রাগে রোষে ভাব রে বসে
নিক্সন চু এন লাই
এদের কূটনীতি চাল
হ'ল বানচাল এখন কি করি উপায়
সাইয়ার সাথে আঁধার দেখে
এখন ন্যাড়া ঠাটায় ॥
১. ভিয়েৎনাম যুদ্ধে এদের দোমুখো গতি
ভারতদমনে এলো জমাযে দস্তি
পাকিস্থানে এরা জেলে লালবাতি
জোড়া বাঁদর নাচায়। ····
আমেরিকা দেবে রাশিয়ার পাল্লা
চীন চালাবে ভারতে হামলা
দুনিয়া জুড়ে ধ্বংসলীলা
চালাতে নিশ্চয়—দু মাতাল
তুলেছিল পাল, সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার।

*   *   *

ভারত সোবিয়েৎ মৈত্রী চুক্তি
পূর্ব বাংলার আনলে মুক্তি
রুখবে কেবা এদের শক্তি
দেখিয়ে জুজুর ভয়
কেটে খাল ডাকবে কুমীর
সকল দুরাশায়।

ইদানিং কালের গম্ভীরা পূর্বেকার ধর্মপূজা, সূর্যপূজা, শিবপূজা, গাজন, কৃষি, মৎস্য-শিকার, বৃক্ষরোপণ, শস্য উৎপাদন, পশুপালন প্রভৃতি বিষয়-গুলি আত্মস্থ করে ক্রমঃবিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক মানসিকতার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। কখনো তা বিশ্বজনীনতায় উদার!

একটি ডুয়েট-ধর্মী গান

English Fighting (ইংরেজী কলহ)

পুং : রাখ লেক্চার আর হট্ টেমপার
মাই ডিয়ার দিদিমণি
বাইচান্স একসিডেন্ট,
কি হলো এমন খুন জখম ত হওনি।
নারী : টেক কেয়ার অব দি ফিউচার
নেচার তোমার খুব রাবিশ
চড়িয়ে ভাঙ্গব দাঁত দুপাটি, মাইণ্ড স্যাট
রে ফুলিশ!
পুং : স্বাধীন যুগে তোমরাই ধন্য
আমরা পুরুষ অতি নগণ্য
হাঁট গট্ গট্ করে সিনা চেড়ে
কেমন রণরঙ্গিণী
স্ত্রী : স্বাধীন যুগের আমরা লেডী
পরদানসীন নইকো বাঁদী
লেট হট গো সমাজ বিধি
পুং : হাল ফ্যাশানে তোমরাই দড়
সাইকেলে আর ঘোড়ায় চড়
আবার হারমোনিয়মে প্র্যাকটিস কর
সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি

বীণার সাথে কসরত কর
দীপক রসের রাগিণী।

স্ত্রী : লিয়া ট্রেনিং পেয়েছি পাওয়ার
মিসলিড্ করিব নেভার
ফেমাস ফেমিলির আমি ডটার
কেয়ারফুল কথা বলিস

পুং : লাজের বালাই ডোণ্ট কেয়ার তাই ফ্রি
গতি এভ্রিহোয়ার
ড্রেসিং পেন্টিং ফুল ফেয়ার
যেন বিলাত হতে আমদানী

স্ত্রী : মোদের নিয়া করিস কালচার
বুঝবি কিসে নারী ক্যারেকটার
টার্ম মোদের ব্রাদার সিসটার
সবি কথা সত্যি জিনিষ

পুং : শাড়ির বাহার আর ব্যাগ ভ্যানিটি
বাইরে চটক্ ইন্সাইড্ এম্টি
নারীর ধরম করলি মাটি
হায়রে রঙ্গা রমণী।

স্ত্রী-পুরুষের বোল কাটা-কাটি ধরনের ডুয়েট জাতীয় গান গ্রামীণ অন্যান্য সঙ্গীতেও আছে—পাঁচালী আলকাবা, ঝুমুর প্রভৃতি গানেও ডুয়েট জাতীয় গান লক্ষ্য করা যায়। ১৩৭১ এর প্রলয়ংকরী বন্যায় মহানন্দার প্লাবনে গঙ্গার জলের চাপে মালদহ জেলা ও মালদহ শহরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও সাধারণ মানুষের ভীষণ দুর্বিপাক হয়।

সে কথা গম্ভীরার কবি তার একটি গানে এঁকেছেন :

কোন লগনে এসেছিল এ দুনিয়ার বুকে জনম গেল দুঃখে দুঃখে

দুঃখের উপর দুঃখের বোঝা এ দুঃখ ভাই রাখব কোথা
সুখের পিণ্ডি চট্‌কে সোজা দুঃখ জানাব কাকে ॥

১. দেখনু এবার বন্যার খেলা জীবনে কি যাবে ভুলা
ঘর বাড়ি সব জলের তলা বাসা লিনু ছাদে হে
কুকুর বেড়াল বকরা বকরি উঠল বেয়ে স্বর্গের সিঁড়ি
সবাই মিলে একসাথে তারা গুনল দিনে রাতি
উপরে আসমান ছেনালি লাঞ্ছনা বলব কোন মুখে

২. হাটবাজার সব হল বেতাল হাঁড়ি চুলা করল হরতাল
এক ট্রাক বোঝাই গরম গরম মাল খিঁচুরী সুন্দরী হে
শিশু নারী বাসন হাতে ছুট দিল তার পিছে পিছে
কেউ পায় ভর্তি করে হাঁড়ি কারো ভিজলে ছেঁড়া শাড়ি
তোমার ভাঙ্গা কেষ্টার মা দৌড়ে মরে মলো ফাঁকে ॥

৩. সরকার দিলে গহম G. R. বেবী ফুড্ মিল্ক পাউডার
বার ভূতে করলে পাচার গণেশ পূজা দিয়ে হে
খোলা পেয়ে লুটের বাজার গিন্নী কারো পরে চাঁপাহার
কেউবা গিন্নী সাথে করে দার্জিলিং এলো ঘুরে
আমরা ভাই এমনি মেকী স্বর্গের ঢেঁকি মরছি কপাল ঠুকে ॥

*   *   *   *

৪. ভূমিকম্প আর ঘূর্ণিঝড়ে পুরী জগন্নাথ দিল মেড়ে
হিক্কা হিয়ার বুদ্ধি ফেরে চমকায় পেটে পিলা হে—
ট্যাংক কামান মিলিটারী বর্ডার উপর হল চেরী
ভিতরে আগুন দেবার তরে দুশমনের গুপ্তঘাতক ঘুরে
দেশের দশা হল ফর্সা এখন মরব লাখে লাখে ॥
ভেবে দাস উপেন লেখে।

বন্যার ধ্বংসলীলার উপরেও আছে মানুষের লালসা ও দুর্নীতি। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মানসিকতার বোধকে যখন করতে হয়

বিকশিত—তখন এক শ্রেণীর মানুষ দুঃসময়ের সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করেছেন তাই গম্ভীরার কবি যথার্থই লিখেছেন : "বার ভুতে করলে পাচার গণেশ পুজো দিয়ে হে"। আমাদের দেশের অবক্ষয়গ্রস্ত সমাজের এটা একটি যেন সহজ ও স্বাভাবিক চিত্র। সাধারণ মানুষ শুধু প্রকৃতির প্রহার নয় তার সাথে মানুষের অবিবেকী নির্যাতন ও ভোগ করে, এটাই এ সমাজের দুঃখজনক পরিণাম।

"বি. ডি. ও-র প্রতি চাষী" শীর্ষক গম্ভীরা গানে সরকারী অফিস ও সরকারী ব্যবস্থা তথা বি. ডি. ও-র মত সরকারী অফিসার সম্পর্কে সাধারণ গ্রাম্য চাষীর মনের কথা প্রকাশ পেয়েছে :

বাবু হে—চটে কেন হচ্ছ লাল একদম বেতাল
কেন হারাচ্ছ হুঁস আমরা মানুষ তোদের কলম মোদের
হাতে হাল।

১. লিয়া দুটা দুঃখের কথা বলতে এসেছি
ঘৃণা ভরে ঠেলছ দূরে আমরা যেন কি—বাবু হে
তোদের মধুর ভাষা 'ব্যাটাগোরু' করব হজম আর কতকাল।

২. মোরা রোদে পুড়ে জলে ভিজে রক্ত করে জল
হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে মাঠে ফলাই ফসল—বাবু হে
মোদের দুঃখের দানা খেতে দিবি না তাই পেতেছ আইনের জাল

৩. তোমরা ঠাণ্ডা মাথায় কলম খাতায় কষছ লেভী
মাটির রকম খরা বর্ষণ ভেবে দেখেছ কি—কত আছে পশুপাখী

৪. কৃষক বাঁচলে কৃষি বাঁচবে খেয়ে বাঁচবে দেশ
দেশের ফিরবে দশা সেই দুরাশা মনেই হবে শেষ (বাবু হে)
দাস উপেনের উক্তি
হবে দেশের উন্নতি সরবে যেদিন পঙ্গপাল।

৫. বৈজ্ঞানিক মতে আবাদ করতে তোদের বাসনা
কাগজ কলমে ফলাও প্রচুর ফলন ঘরে ওঠে না

বেশ বারভূতে খাচ্ছ লুটে উড়াইছ সুখে মজার পাল।

গম্ভীরার কবি গ্রামীণ চাষীর মনের কথার ইঙ্গিতই দিচ্ছেন।

'পরিবার পরিকল্পনা' কথাটা আর কেবলমাত্র দেওয়ালে টাঙানো 'লাল ত্রিকোণ' এর প্রতীক সম্বলিত সরকারী বিজ্ঞাপন মাত্র নয়। পরিবার পরিকল্পনা আজ গ্রামের সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁচেছে। সে সম্পর্কে সাধারণ গ্রাম্য মানুষের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাক। একটি গম্ভীরা গানের মধ্য থেকে :

বার্থ-কনট্রোল

পতি : যাই বল না বার্থ কনট্রোলের ছুটেছে বন্যা
করে অপারেশন রুখতে সন্তান সরকারী এ কল্পনা।

পত্নী : তুমি বলছ কি কে তোমারে দিলে সুমতি
মা ষষ্ঠির দ্বারে ধর্ণা দিয়ে মানুষ করা চাই

পতি : একটি ছেলেই বংশের বাতি যদি তেমন হয়.।
হলে গণ্ডা গণ্ডা ষণ্ডা গুণ্ডা ভুগতে হয় ঘোর যন্ত্রণা

পত্নী : একার কেবা আছে দান তুমি করতেছ বাখান
বিচার করে বল দেখি ওরে বুদ্ধিমান
একটি ছেলে যমে নিলে কে বংশে দেবে বাতি

পতি : অধিক প্রমাণ প্রসূতির দশা কি হবে
শরীর স্বাস্থ্য করে নষ্ট কবরে যাবে
হয়ে রোগের খনি দেহখান বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা

পত্নী : কত সাধনার ফলে জননী পুত্র পায় কোলে
দুঃখজ্বালা সব যায় গো দূরে মধুর মা বলে
অভাগীরা পাবে কোথা পুত্র পায় ভাগ্যবতী

* * *

পতি : তোমরা জাতিতে বামা কভু ডাইনে হাঁটবেনা
বললে জান উল্টা বুঝ স্বভাব যাবে না

ইত্যাদি

গম্ভীরা গান বাংলার লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গৌরবের স্থানাধিকারী। এই গৌরবময় লোক-সংগীত এর সঙ্গে অনেক খ্যাত অখ্যাত শিল্প প্রতিভা যুক্ত থেকেছে। যেমন "আইহো মুবিয়ার কৃষ্ণদাস, গোলাম গুপ্ত, গোপাল গুপ্ত, বিপিন খলিফা, সনাডাক্তার, ইমারৎ হোসেন চৌধুরী, মাধাইপুরের মাধাই গোঁসাই, ভোলাহাটের ধর্মদাস মণ্ডল, সাহাপুরের হরিমোহন কুণ্ডু, গায়েনপুরের কামনাবিহারী গোস্বামী, ধরাজবাজারের মনোরঞ্জন দাস, শরৎচন্দ্র দাস, মোহাম্মদ সুফী, গোবিন্দলাল শেঠ; মহদীপুরের ধনকৃষ্ণ অধিকারী, অমৃতি গ্রামের দেবদুলভ তাঁতী, ধানতলা গ্রামের গদাধর মণ্ডল, মহেশপুরের গোপালচন্দ্র দাস, ইদানিংকালের সতীশ গুপ্ত, রজনী সরকার, ইন্দ্রদমন শেঠ, উপেন্দ্র সরকার, গোপীনাথ শেঠ, দেবনাথ রায়, বিশ্বনাথ পণ্ডিত, রাম পণ্ডিত, ধরণী সাহা, ডুকড়িলাল চৌধুরী, মৃত্যুঞ্জয় হাজরা, মুচিয়ার, শ্রীতারাপদ লাহিড়ী, অভিনেতাদের মধ্যে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মটরা), শ্রীনির্মল কুমার দাস (নিরং) ও শ্রীডুকড়িলাল চৌধুরী উল্লেখ্য।" [গম্ভীরা লোক-উৎসব একাল ও সেকাল, শ্রীপ্রদ্যোৎ ঘোষ]

গম্ভীরা গানের বিচিত্র বিষয়বস্তু—বেরুবাড়ী প্রসঙ্গ, নেহরু-নুন চুক্তির প্রতিবাদ, ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বোটানিক্যাল গার্ডেন্স এর মধুচক্র, নেহরু-চৌ বৈঠক, লাভ ম্যারেজ, বিধবার করুণ কাহিনী, মেয়ের সঙ্গে মায়ের বাক্‌যুদ্ধ, বেকার স্বামী ও রোজগেরে স্ত্রীর কলহ, কংগ্রেসী নেতা ও মিলের মালিক এবং কণ্ট্রাক্টর, আসামের দাঙ্গা, রোগীর সিট প্রার্থনা, ভোট প্রসঙ্গ, মন্ত্রীর নিকট প্রার্থনা, কর্মচারীর আবেদন, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, ভুট্টো, চৌ-এন্‌-লাই, নিক্‌সন্‌, স্বর্ণদান কম্যুনিষ্ট নেতার প্রতি, স্বর্ণশিল্পীর আবেদন, পরিবার পরিকল্পনা, শৌলমারীর সাধু, কীর্তনভক্ত স্বামী ও সিনেমাভক্ত স্ত্রীর কলহ, শেখ আবদুল্লার প্রতি, সদাচার সমিতি, তাসখন্দ চুক্তি, মজুতদারীর বিরুদ্ধে, কংগ্রেসী স্ত্রী ও বামপন্থী স্বামী, অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল সেনের প্রতি, যুক্তফ্রন্টের প্রতি,

প্রফুল্ল ঘোষের প্রতি, রাষ্ট্রপতি শাসন, ভোটের গান, আদি কংগ্রেস বনাম নব-কংগ্রেস, হরতাল, মুজিব, ইন্দিরা গান্ধী, অজয় মুখার্জী ও জ্যোতি বসুর প্রতি, চাষী ও কলেজ ছাত্রী, মুক্তিযুদ্ধ ও পূর্ব বাংলার যুদ্ধ ইত্যাদি।

এই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী গম্ভীরা গান বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও শিল্পপ্রাণ কয়েকজন প্রতিভার অক্লান্ত সাধনায় ও বিপুল জনসমর্থনে এগিয়ে চলছে। দ্রুত রূপ পাল্টাচ্ছে। আরো পরে হয়তো গম্ভীরা নতুন আঙ্গিকে ও বক্তব্যে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে আরো অনেক প্রতিভাধর লোক-শিল্পীদের আন্তরিক সাধনায়।

শ্রীতারাপদ লাহিড়ী ও তাঁর সম্প্রদায় এই লেখাটিকে প্রচার করছেন দীর্ঘদিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে ও আকাশবাণী'র মাধ্যমে। শহরে শহরে পরিবেশনের উপযোগী করে সংক্ষিপ্ত ও আংশিকভাবে গৃহীত হয়েছে। "মটরার গম্ভীরা" আর তারাপদ বাবুর গম্ভীরা এক নয়। তারাপদ বাবুর গম্ভীরা মালদহের স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে কলকাতার নাগরিকজনদের মুখ চেয়ে পরিবেশিত হয়। আর মটরা বাবুর গম্ভীরা স্বাভাবিক পরিবেশে সহজ ও স্বচ্ছন্দে অকৃত্রিমভাবে স্বতোৎসাহিত হয়ে জনচিত্তকে জয় করে।

গম্ভীরার বর্তমান রচয়িতাদের মধ্যে শ্রীচুকড়ি চৌধুরী ও শ্রীউপেন্দ্রদাস অন্যতম।

গম্ভীরা গানের মত গম্ভীরা মুখোস নৃত্যেও প্রভূত পরিমাণে সমাজ চেতনার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বিধৃত। এ সম্পর্কে বন্ধুপ্রতিম অধ্যাপক শ্রীপ্রদ্যোৎ ঘোষ মহাশয় আলোকপাত করেছেন। বিষয়টি স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

পুলকেন্দু সিংহ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১. একটি অসমাপ্ত কবিতা

"The breath of his life
He has taught to be language,
The spirit of thought."



জীবনের নিঃশ্বাস যে ভাষা
আমাদের চৈতন্যকে করে যে বাঙ্ময়, অবচেতনাকে
জ্যোতির্ময়
আমাদের বুকের ভিতরে রক্ত-চলাচল স্পন্দিত করে যে
মন্ত্রে, মানবিক প্রত্যয়ে, শপথে ;
আত্মাকে যে শুদ্ধ করে তেজে, করুণায় করে নমনীয়,
প্রেমে অপরূপ ,
স্বাধীন স্বচ্ছ মুক্ত ধারা ;
জীবনের নিঃশ্বাস যে ভাষা ; মানুষের মনুষ্যত্ব ;
কবির কবিতা—
যদি শৃঙ্খলিত হয় ; যদি বিস্তারিত হয় হৃৎপিণ্ডের
রক্ত নদী ; যদি···

[১০ আশ্বিন, ১৩৮২]

২. স্বদেশ ! আমার স্বদেশ !

"Purer than the tall candle"—W. B. Yeats



স্বদেশ ! আমার স্বদেশ ! তোর পবিত্র কন্যারা
মোমের মত জ্ব'লে যাচ্ছে, যেমন আয়ারল্যাণ্ড;

যেমন কবি ইয়েটস ; যেমন রক্তের ক্ষীণধারা
জ্বলে রাত্রি গভীর, ততই প্রতিজ্ঞায়।

যতই বাজাক জগঝম্প প্রতাপাদিত্যেরা ;
(তারা চক্ষু লাল ক'রেছে) ; তোর কী আসে যায়।
(তারা আঁধার করেছে ঘর) ; স্বদেশ ! আমার স্বদেশ !
ঘরের কোণে নিবন্ত মোম, একটি প্রতীক্ষায়···

একটি প্রতিজ্ঞায়···
স্বদেশ ! আমার স্বদেশ !

[ভাদ্র, ১৩৭২]

৩. অন্ধকারে রগুজীনের বাড়ী

ফিওদর দস্তোয়েভ্স্কী-র 'The Idiot' মনে রেখে



অন্ধকারে রগুজীনের বাড়ি
দাঁড়িয়ে আছে যেন ভয়ের বাতাসে ভর দিয়ে।

কখন বাঘ দেখে গিয়েছে তাকে !

বুকের ভিতর কান্না নিয়ে একটার পর একটা সিঁড়ি
পার হয়ে যায় কুইক্জোটের রক্তমাংসের শরীর।

[৫ ভাদ্র, ১৩৭২]

কল্যাণ সেনগুপ্ত

১. হৃদয়তিমির

কৈশোরে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পার হয়ে কলকাতা যেতাম,
নিশুতি রাত্তিরে নদী পার হতে হতো,
দু-তিনশো ফুট নিচে কালো ঘূর্ণ্যমান জল কী অমোঘ ছায়া ফেলতো বুকে।
ভোর হলে জলে-ধোয়া কলকাতার মুখ
দেখে ভাবতাম তাকে কতকাল দেখিনি যে, আহা, কতকাল!
তবু সেই গমগমে রাত্রির বিশাল সেতু, নদী কুহকিনী,
দু-একটি নক্ষত্র-জ্বলা কালিন্দীর অন্ধকার বুকে বয়ে পথ চলতে চলতে মনে হতো
আমার চারপাশে বুঝি দপ্ করে নিভে যাবে সুখী, ছিমছাম কলকাতা।

তারো বহুকাল পরে আশ্বিনের ভোরে একদিন
তিনধরিয়ায় এক টিলা পাহাড়ের চূড়া থেকে
পুজোর আকাশ দেখে হঠাৎ বাঁ দিকে চোখ যেই নামিয়েছি—
দুপায়ের পাতা বেয়ে হিমস্রোত উঠে এসে হৃৎপিণ্ড আঁকড়ে ধরেছিল।
কয়েক হাজার ফুট পতন, পতন শুধু, নিস্তল পাতাল
বিশাল হাঁ-মুখে তার, মনে হলো, গ্রাস করে নেবে
টিলা পাহাড়ের চূড়া, ছবির মতন বাড়ি, একখণ্ড বিপন্ন আকাশ;
মাথার উপরে সূর্য মহাকর্ষে খসে যেন স্ফুলিঙ্গের মত
নামতে নামতে ডুবে যাবে প্রাগৈতিহাসিক ঘন রাত্রির জঙ্গলে।

একবার অতল নদী, অন্যবার পাহাড়ের অতল বিষাদ
দেখে সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশ ভুলেছি।
মানুষের কাছে যাই, 'আমাকে অতলস্পর্শ গভীরতা দাও'

ব'লে নারী, আজন্মসুহৃদ্
সবার সকাশে যাই। মনের দরোজা খোলা পেলে
খানিক ভিতরে ঢুকে তারপর দেখি শুধু অন্ধকার, অন্ধকার,
মগ্ন অবরোহণের সিঁড়ি।
জানি না কোথায় যাই, মানুষের হৃদয়তিমিরে
অতলান্ত মৃত্যু চেয়ে অচঞ্চল ডুবে যাওয়া, মনে হয়, আমার নিয়তি।

২. যক্ষিণী

তুমি বড়ো অবেলায় এসেছ যুবক,
ওরা কেউ নেই।
বসতবাটীতে ছায়া রেখে যেতে হয় ব'লে রেখে গেছে কেবল আমাকে।
তুমি কি ওদের খোঁজে যাবে?

এতক্ষণে ওরা
শিমুলতলার সাঁকো পার হয়ে দক্ষিণের নিঝুম প্রান্তর
তাও পার হয়ে কোনো হাঁসডাকা জলা কিংবা নদীর কিনারে
উজ্জ্বল রোদ্দুরে হেঁটে চলেছে। তাৎক্ষণিক বিষম কৌতুকে
অট্টহাসি হাসতে হাসতে ওরা একেবার ভুলে গেছে
তুমি দলভুক্ত নও; পরিত্যক্ত বাড়ির ছায়ায়
একা, ম্লান দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আর কি ওদের খুঁজে পাবে? ভাখো, বেলা
প্রায় পড়ে এলো।
হাওয়ায় শীতের ছোঁয়া, সব কটি বৃক্ষ থেকে ঝড়ে পড়ে পাতা।
জানি না ফেরার কথা কখন ওদের মনে হবে,

বা আদৌ ফিরে আসবে কিনা।
হে যুবক, কিছুক্ষণ কাছে এসে ব'সো।
এ-বিশাল বাড়ির ভিতরে
কতকাল থেকে আমি লোলচর্ম যক্ষিণীর মত
বেঁচে আছি একা!

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

১. আনন্দ

একটি শিশুর হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে
আমরা ধাপে ধাপে
আমাদের জটিল মাংসল দেহের খোলস
ছাড়াতে ছাড়াতে
একেবারে নরম প্রাণের শরীর
পেয়ে যাই।

একটি শিশুর সঙ্গে হাসতে হাসতে
আমরা ধাপে ধাপে
আমাদের জটিল মাংসল দেহের খোলস
ছাড়াতে ছাড়াতে
একেবারে আনন্দময় সত্তার ধ্বনির রাজ্যে
পৌঁছে যাই।

একটি শিশুর সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে
আমরা ধাপে ধাপে
আমাদের জটিল মাংসল দেহের খোলস
ছাড়াতে ছাড়াতে
একেবারে ঈশ্বরের অকপট ক্রোড়ে
আশ্রয় পাই।

২. ভয়

ঘুঁড়ির লাটাইয়ে কেউ হাত দিলে
আমার মাথায় খুন চেপে যায়,
অথচ ঠিক আমাকে ফাঁকি দিয়ে
বাড়ীর ছেলেরা কেউ না কেউ
বাচ্চা চাকরটাকে সঙ্গে করে নিয়ে
ছাদে উঠে যাবে—

—বাড়ী আসবার পথে
আমার চোখে পড়ে যায়
দু'একবার পড়ে যায়—
আমাকে ভয় করে ব'লেই তাড়াতাড়ি
দু হাতে সুতো টানতে টানতে
ঘুঁড়ি নামিয়ে নেয়
এবং ঘুঁড়ি-লাটাই নিয়ে
তাদের গোপন দুর্গে লুকিয়ে রাখে—

অফিস থেকে ফেরার সময়
এই দৃশ্য আমি দু'একবার দেখেছি
কেমন ক'রে আকাশের এক উঁচুতলা থেকে
একেবারে নীচের তলায়
ঘুঁড়িটাকে
কয়েকটি টানে
নামিয়ে নিয়ে আসে
দুটি দক্ষ হাত—

দেখে আমার শরীর ভয়ে থরথর ক'রে
কাঁপে
ঠিক ঐভাবে কেউ যদি আমাকেও
নীচে টেনে নামাবার জন্য
তার দক্ষ দুটি হাত
লাটাইয়ে রাখে ভাবতে ভয় করে,

আমার শরীর ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপে।

শোভন সোম

১. অভ্যাস

দেখা হলে, কেমন আছেন—
টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন,
এসব নিত্য ক্রিয়া।
সব কিছু চাই হিসেব কষে
ওজন দরে,
যাচাই ভালোবাসায়,
সমস্ত ক্ষণ ভীষণ যেন ঠকে যাওয়ার ভয়!

২. নিবেদন

গুরুদেব, শুধু নিজের দিকেই
চিরকাল তাকালেন।
ফলে দেখলুম, আপনার অই
চশমার ফাঁকে চোখ
নেই, আছে দুটো গুহা—
গুহার ভিতর অনড় অন্ধকার।
অথচ আপনি 'আলো আলো' বলে
চেঁচিয়ে গেলেন সারাজীবন!

৩. সাম্প্রতিক

নাম ধরে আর ডাকে না কেউ,
যারা ডাকতো তারা এখন ছবি।

আমার নাম কি ফুরিয়ে গেছে
অথবা কেউ রেখেছে গচ্ছিত
কাণাকড়ির দামে !
আমার নাম কি হারিয়ে গেছে
কিংবা আমি বন্ধ হয়ে আছি
ভুল ঠিকানার খামে !

প্রদীপ মুন্সী

১. খুলে রেখো

মারা গেলে
দরোজা খোলা রেখো
মারা গেলে
জানালা খোলা রেখো
পর্দা তুলে দিও
দেখেছি
শিষ ঠোঁটে
বালুচরে উড়ে যায় কাক
রঙীন বেলুন হাতে শিশু হেসে ওঠে
নারীদেহ
মেঘের জলের ভেলায় ভেসে যায়
মারা গেলে
সব খোলা রেখো

২. নীল জলে

ভাঙা বুকে কার ডাক চিৎকার
হৃদয়ের পারাপার নীলজলে
ভেসে যায়
এখন কঠিন দিন শুধু জটিল গলির পথ
এখন কেবল খোঁড়া আর ভেঙে-ফেলা
কোন দীপ্তি নেই শুধু বণিকের ধূর্ত সংকেত

চতুর দংগলের কোলাহলে আমিও তো একজন
হৃদয়ের পারাপার তবু
কেন নীল জলে ভেসে যায়।

৩. বিষাদের ধ্বনি

ক্লান্ত নূপুরের গাঢ় সুরে
বিষাদের ধ্বনি
অস্পষ্ট কুয়াশার মতন কেন ছড়ায় ?
যে চলে গেল কি জানি তার নাম
নিবিড় ছায়া পুকুরের পাড়ে
টুপ্‌টাপ বকুলে শুধু হাহাকার
হাওয়ার মতন ঘুরে
বিষাদের ধ্বনি কেন আকাশ ছুঁয়ে যায়
যে চলে গেল কি জানি তার নাম।

৪. শাশ্বত

মন্দিরে নামের রেখা বারংবার লুপ্ত হয়ে গেছে
প্রতিমার উজ্জ্বল ধার আঘাতে মলিন হয়েছে
ভালো গান সোনালী চূড়া শুভ্র বসতি
ভয়ের গোপন শাসনে নীল হয়ে গেছে ;
তবু আলোর সিঁড়ি গড়ে
বারবার আমরা
ওপরে উঠতে চেয়েছি।

লুই ম্যাকনীস্

বিচিন্তা

বিদায় হে শীত, বিদায় !
দিন ক্রমে দীর্ঘ হয়ে আসে—
চায়ের পেয়ালায় চায়েব পাতাটা
যেন, অগ্রদূত অজানার ।

সে কি আনবে কোনো কাজ ?
কোনো আনন্দলোকের বার্তা ?
কিংবা সে আসছে—
আপন দহন জ্বালা জুড়াতে ?

ফেরিওলার মত ঝোলা ঝুলিয়ে
বাগানের পথ ধরে—
সে কি আনবে কোনো অনুনয়,
না শুধু দর কষাকষি ?

আসবে কি জ্বালাতে আর পোড়াতে
হাতের তালুতে নিয়ে প্রতিশ্রুতি
নয়তো কোমরে ঝুলবে
বারুদভরা মরণ-বাণ ?

তার নাম কি জন ?
কিংবা হবে জোনা ?

আয়োনার সেই নিরালা দ্বীপে বসে
নিঃশব্দে ফেলবে চোখের জল ?

তার নাম হয়ত জেসন
খুঁজছে কোনো নাবিককে
নাকি নিছক অকারণে
খুঁজ্ছে কোনো উন্মাদ জেহাদী ?

কি বাণী সে বয়ে আনবে
যুদ্ধ কর্ম না বিবাহ ?
প্রত্যূষের মত কোনো তাজা সংবাদ
কিংবা কোনো পচা পুরাতন উক্তি ?

সে কি আমার সকল প্রশ্নের
দিতে পারবে চূড়ান্ত উত্তর ?
না তার হেঁয়ালি-ভরা কথায়
শুধু এড়িয়ে চলার ছন্দ ?

তার নাম কি প্রেম ?
কথা কি তার প্রলাপ ?
তার নাম কি মৃত্যু ?
আর বাণী তার
সহজ সরল !

রূপান্তর : ভবানী মুখোপাধ্যায়

ল্যাংস্টন হিউজ

মার্কিনী কৃষ্ণকবিতা

১. কী হবে আজ যদি
স্বপ্ন মুলতুবি রাখি ?

শুকোবে কিসমিস রোদে ?

ঘায়ের দগদগে
পুঁজে কি মজবে ?

বেরোবে গলগল রসে ?
পচবে বাসি তুর্
গন্ধ মাংসে কি ?

অথবা টসটসে
টাট্‌কা সরপুলি স্বাদে ?

স্বপ্ন দমাদম
গোঁত্তা মারে
নাকি সে তুবড়ির
আওয়াজে ফাটে ॥

(Harlem)

২, এক রাতে পরপর
তিনটে নিমন্ত্রণ

মনি বলে শেষটিতে
মশাই আমার নন

একটু তো থাকেই
তালগোল পাকানো
মুলতুবি স্বপ্নে

এ-নদী ও-নদী ঘুরে
ও-শহর সে-শহর ক'রে
বাড়ে জট—পায়ে পায়ে
স্বপ্নের ফুটবল ঘোরে ॥

(Same in Blues)

[প্রখ্যাত মার্কিনী কবিদের অন্যতম Langston Hughes (১৯০২-১৯৬৭) নিগ্রো কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত। মনে হয়, তাঁর কবিতার সবচেয়ে বড় গুণ হলো সারল্য। নিগ্রোজীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কুড়িয়েছেন তাঁর কাব্যের উপকরণ : হার্লেমি কথোপকথনে গড়া তাঁর কাব্যভাষা, ছিন্নমূল অপাংক্তেয় দৈন্যজর্জরিত সম্প্রদায়ের সংগ্রামমুখর ছবি ও গানে-গড়া তাঁর কাব্যের ভাবকল্পগুলি। একটি খণ্ডজাতি তাঁর কাব্যে স্পন্দিত দেখি। এই স্পন্দমান রূপটি যেমন সম্পূর্ণ, তেমনই স্বতোস্ফূর্ত। দুঃখে সুখে কলহে হাস্যে পরিহাসকৌতুকে এই রূপটি যেমন বাস্তব, তেমনই নয়নাভিরাম। অবশ্যি সচেতনভাবে তিনি লিখেছেন নিগ্রোদের জন্যে। কিন্তু মজা হলো যে অ-কৃষ্ণাঙ্গরাও তাঁর কাব্যরসে তৃপ্তি পান। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব। অনূদিত কবিতা দুটিতে হিউজ-এর এই গুণটি বজায় রাখা গিয়েছে কিনা রসিকজন তার বিচার করবেন ॥]

রূপান্তর : পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

শান্তিকুমার ঘোষ

মোটর-বাইক গ'র্জে যুবা

লম্বা সরক বেয়ে মোটর-বাইক গ'র্জে চলেছে যুবা
সামনে ক্ষিপ্র স'রে যায় খরগোস
মাথার ওপরে বাদুর উঠলো লাফিয়ে
দিনমান নিভিয়ে দিয়ে অষ্টাদশ অশ্বশক্তির ওই ইঞ্জিন
রাত্রিকে ধরি-ধরি করছে

পরিখার ওপর পাটাতনের সাঁকো
সশব্দে পার হ'তে-না-হ'তেই
খুলে যায় তোরণের বিশাল দরওয়াজা
চত্বর বাগান সরোবর ছাড়িয়ে
মঞ্জিলের উঠে-যাওয়া সোপান-পঙক্তির সামনে থামলো আরোহী

ব্যালকনির পরে
এলো মেলো শালীনতা নিয়ে
দাঁড়িয়েছে প্রিয় নারী
যেন সমস্ত রুধির উচ্ছ্বসিত কপোলে

আর ইতিহাস ফুঁড়ে-আসা নায়ক
যেহেতু হৃদয় অন্ধ, তৃষ্ণারও নির্বাণ নেই
ধায় এক আদিম জান্তব বেগ
উন্মত্ত মিলনের দিকে

সময়ের অর্থহীন গর্জন ছাড়িয়ে
স্বপ্নের ভেতর তারা বুনে যায় নাচ
ঘুম-ভাঙা পাখীদের আবহ-সংগীত দোলে
এক ফোয়ারার থেকে অন্য ফোয়ারার মুখে
জলপরীদের সেই মৃত্যুহীন নাচ

মানুষের হৃদযন্ত্র দুর্বল যেহেতু
পারে কী বইতে সুখ অসহন
ব্যূঢ় স্কন্ধে মাথা রেখে
এলিয়ে গিয়েছে মেয়ে
দয়িতের অজান্তে অকস্মাৎই তার থেমে গেছে ঘড়ি

টপকে প্রাকার পরিখা পেরিয়ে
উড়ে যেন ফিরে গেল পক্ষিরাজ কিম্বা ওই উদাসীন যুবকের মোটর-বাইক

মৃগাঙ্ক রায়

একটি লাল ফুল

কাল ভোরে
একটা লাল ফুল দিয়ে যেও আমাকে ।

কাল
আবার পোশাক পাল্টাব ।
এখন কত রাত ?
বর্ষার ভরা পুকুরের মত
আকাশের কানায় কানায় অন্ধকার ।

ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। গাছগুলো দল বেঁধে
ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে ;
পাতায় হাওয়ার শব্দ, চারিদিকে
অদৃশ্য মানুষের নিঃশ্বাস।

কাল ভোরে
মানুষের মত
আবার সামাজিক পোশাক পড়ব,
আমার সুসংগত মিথ্যাকে
ডাকের সাজ পরাব,
রক্ষিতাকে ভোরের প্রথম ফুল পাঠাব।

এখন কত রাত ?
ভোরের আলো ফুটলে
একটা লাল ফুল দিয়ে যেও আমাকে ॥

অসীম রায়

হু হু করে দিন যাচ্ছে

হু হু করে দিন যাচ্ছে হু হু করে দিন
মাসের প্রথম শুরু হতেই মাসের শেষ দিন
সখা, কোথায় ছুটছো কোথায় শহীদ মিনারে—
শহীদরা সব কোথায় গেল, কখন ফুৎকারে
যা কিছু ভাবা গিয়েছিল সমস্ত খান খান,
এদিকে দুই যুবক লড়ে ওদিকে সাইগন ॥

হু হু করে দিন যাচ্ছে হু হু করে দিন,
মাসের প্রথম শুরু হতেই মাসের শেষ দিন।
সখী, তোমার চোখে নাকি বিশ্ব নেচেছিল
তোমার বাহুর দোলা লেগে মরণ পালিয়েছিল ?
যা কিছু বলা হয়েছিল সমস্ত চুপচাপ,
তলোয়ারটা আটকে গেছে খোলেনি তার খাপ ॥

হু হু করে দিন যাচ্ছে হু হু করে দিন,
মাসের প্রথম শুরু হতেই মাসের শেষদিন।
প্রাজ্ঞ তোমায় সেলাম তুমি বলেছো ঠিক ঠিক
কখন আমি চায়ের কাপে চুমুক দেব ঠিক,
ছক ছেয়েছে আকাশ মাটি, হাড় খেয়েছ টাল
যা কিছু হিসেব জানা ছিল সমস্ত বানচাল ॥

হু হু করে দিন যাচ্ছে হু হু করে দিন,
মাসের প্রথম শুরু হতেই মাসের শেষদিন।
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে কে যাবে বাস স্টপে
কেউ যাব না, জল ভাঙব সবার আগে আগে
এই জলে এই কাদায় এই জীবন বেয়ে বেয়ে
যা ঘটছে সেই ঘটনাই মনের মধ্যে নিয়ে ॥

দিব্যেন্দু পালিত

ভেঙে ভেঙে যায়

একটি মানুষ ধীরে
ভেঙে ভেঙে যায়
একটি মানুষ কেঁপে ওঠে—
একটি মানুষ তার ঘুমের ভিতর
বিপন্ন রক্ত নিয়ে ছোটে !

একটি মানুষ তার হাঁটুর খিলানে
ভাখে ক্রমে স্তূপ হয় বালি ;
অপমানিতের ঘায়ে
সূর্য ঢলে পড়েন পশ্চিমে—
অন্ধকারে জমে হাততালি

আশিস সান্যাল

সংবাদ

সমস্ত রাত
সেই তরল অন্ধকারের বুকে মাথা রেখে
আমি শব্দহীন ঘুমিয়ে ছিলাম
একটা নিথর অবসাদ শঙ্খচূড়ের মতো আমাকে
চতুর্দিক থেকে
আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো ।

মনে হচ্ছিলো
যেন কোনোদিন এই সুগভীর ঘুমের থেকে
আমি আর জাগতে পারবো না।
কেননা
সেই স্পন্দনহীন ঘুমের মধ্যে
স্পষ্ট অনুভব করছিলাম—
এক কোটি নিহত মানুষের করুণ আর্তনাদ।
মেহগনি গাছের মতো
জ্বলতে জ্বলতে
যে-সব সোনালী নারীর উন্মুক্ত শরীর
ক্ষয়ে গেছে
তাদের চিতাভস্ম
আমার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিলো।

মৃত্যুর মতো শীতল
সেই ঘুমের মধ্যে অবচেতনায়
আমার সমস্ত শরীর
যেন হিম হয়ে গিয়েছিলো।
অনুভব করছিলাম
পৃথিবীর সমস্ত নদী আমার ভেতরে স্থির হয়ে যাচ্ছে।

চন্দ্র, সূর্য আর নক্ষত্রেরা আমাকে ঘিরে
যেন প্রতীক্ষা করছে
সেই সর্বশেষ সংবাদের জন্য।

তারপর রচিত হলো সেই সংবাদ
বেতারে ঘোষিত হলো
আমার মৃত্যু-কাহিনী
আর তখন
এক অপরিসীম স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে
আমি অবিরাম
ছুটে চলেছিলাম ॥

দেবী রায়

দাবি

যেনো এক ঘড়ি—এ জীবন
হারিয়ে ফেলেছি চাবি!
কিংবা, হারায় নি
গচ্ছিত আছে
হয়তো বা তার কাছে ;
রাত্রি নামে চোখের পাতায়
হে উদাসীনা, ধড়পড়িয়ে তুমি ওঠো
তাকাও চোখ মেলে ত্থাখো,
সে কি যাবে ফিরে
ডাকো, তাকে আকুল স্বরে ডাকো!
জানো না, কি চেয়েছে সে এতোদিন
মেটাও তার দাবি ॥

মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এরকম হয়

আমার এ রকম হয়—
বিতৃষ্ণা কথায়,
তখন গানেও অরুচি
অনেক কথাই যে গানের নামে বিকোয়

কোনো কথায় বিশ্বাস নেই
আশার কথা কেউ পারে না শোনাতে,
এ রকম হয়—
কথায় বিতৃষ্ণা,
তখন গুমোট কাটাই
বাজনা শুনে—
সেতারের মাঝ-খাম্বাজে।

রাণা চট্টোপাধ্যায়

আত্ম-বিষয়ক

আমি এখন অভ্যস্ত হচ্ছি কর্মহীনতায়
আমোদপ্রমোদের দিন অকারণ দুঃখ সংগ্রহ করা
তুমি বিতরণ কর সুগন্ধ ঠোঁটের
আমি অনভিজ্ঞ ভাবে আস্বাদন করি
বড় নৌকায় চেপে তুমি চলে যাও স্বপ্নের দিকে··

আমি তখন অভ্যস্ত হচ্ছি কর্মহীনতায়
আমাকে নিয়ে তুমি কি করবে
আজকাল ছাখো জীবিকা-অর্জনের উপায় জানা থাকে না
সাহিত্য-বিষয়ক কূটতর্কে মুখোশ পরে নিতে হয় কেন জানি না
মনে হয় আমি ক্রমশ হেরে যাচ্ছি সবার কাছে
তবে কি ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলব হাতের রেখা ?

বরং আমোদপ্রমোদের দিন তোমাকে দিয়ে যাব
আমার সংরক্ষিত মৃতদেহ
সেদিনও ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে শীতল চুম্বন খেয়ো
বড় নৌকায় চেপে চলে যেও স্বপ্নের দিকে।

আশিস সেনগুপ্ত

কত কি কথা ছিল

কত কি কথা ছিল বৃষ্টির দিন মিউজিয়ামের সিঁড়ির তলায়
কিম্বা অসমাপ্ত শান্তিনিকেতনের উপল বিছানো পথে
কথা ছিল একদিন হারিয়ে যাব শিমূলতলার পথে
ছোটনাগপুরের কোন পাহাড়ের গুহায় ঢুকে
বেরুব না আর কোনদিন
মানুষ জানবে আবহমান
ওরা ঐ গুহার মধ্যে ঢুকেছিল এরকম এক জ্যোৎস্নার রাতে
ফেরেনি আর—এখনো তপস্যা করে চলেছে
কার জন্যে কে জানে।

রমেন আচার্য

মগ্ন গৃহস্থালি

গভীর বনের ডাক এসেছিল নিজস্ব কৌশলে,
যথাসাধ্য প্রতিরোধ করে গেছি স্বপ্নের ভিতর।
হাওড়া ষ্টেশনের মতো দুর্ভেদ্য ফটক
পার হয়ে হাওয়া আসে। ছিটকিনি কেঁপে ওঠে,
ঘষা কাঁচে ছায়া সরে যায়।

'দেখা হবে' বলেছিলাম। অস্ফুট সে প্রতিশ্রুতি
কার কাছে? চতুর্দিকে বনভূমি আকাশ পর্বত। নীচে
একমাত্র আহত পুরুষ। তুমি তার মুখোমুখি দুঃখী হ্রদ,
বিষণ্ণ ও একা। সমব্যথী? তোমার গভীব গাঢ় শুশ্রূষার চোখ
জেগে ওঠে জ্যোৎস্নায় অকস্মাৎ তুমি
বুকের আঁচল তুলে অলৌকিক স্বচ্ছতা দেখালে।

'ভুলবো না, দেখা হবে।' সাক্ষী থাক বনভূমি
আকাশ পর্বত।

গভীর বনের ডাক এসেছিল কাল রাতে,
যথাসাধ্য প্রতিরোধ করে গেছি স্বপ্নের ভিতর।
দেখে গেল বিস্মরণ, দেখে গেল আমাদের
মগ্ন গৃহস্থালি।

প্রদীপ দাশশর্মা

মুখোশ

হৃদয় তর্জমা করে সে তুলে দিল ভিক্ষার ঝুলি
হৃদয় তর্জমা করে সে তুলে দিল স্নিগ্ধ মাদুলি
হৃদয় তর্জমা করে সে তুলে দিল ফুল ও লতা
হৃদয় তর্জমা করে সে দিল বিশ্বাসঘাতকতা
এবং মুখোশ

শুভ মুখোপাধ্যায়

জয়োৎসবের দিকে

মৃত্যুর জন্য প্রতিরাত্রে
সে কালো নদীটির দিকে হাত বাড়াতো প্রার্থনায়,
পাতা ও পল্লব ছুঁয়ে বুঝতে চাইত
কোন্ দিক থেকে বইছে বাতাস—
দক্ষিণে দাঁড়ালে অনর্থ বাধতো অহর্নিশ,
অহর্নিশ প্রণয়-বিহীন হয়েছে হাওয়া
ঘুন ঘুন করে কুরে খাচ্ছে দুঃখ।

পায়ের নীচে এমন বেজায় হল্লা ভালো লাগে না আর—

সে কালো নদীটির দিকে হাত বাড়াতো বন্ধুতায়,
প্রতিরাত্রে সে অনায়াসে ভেসে পড়তো সহজ যানে
মানুষ-বিহীন ঘর রেখে
জয়োৎসবের দিকে।

বিমান ভট্টাচার্য

মেঘ, বৃষ্টি, মেয়ে

আকাশ
        কালো করে এলো
        মেঘ
মুখ
        কালো করে এলো
        মেয়ে
        বাতাস চুপ
        মেয়ের মুখ ভার
        সে নেই ঘরে
        কালো মেয়ের মুখ।

        ঝড় এলো ঝাঁপিয়ে
        তাড়িয়ে নিলো মেঘ
        আকাশ জুড়ে আলো
        রং তার লাল টুক টুক।

সিঁদুর
        বয়ে নিয়ে এলো
        মেঘ
মুখ
        আলো করে এলো
        মেয়ে

পড়ালো টিপ
মেয়েরা, শুভ দিনে
এলো সে ঘরে
মেয়ে, তুই বুঝে নে।

গৌতম মুখোপাধ্যায়

অধিকারীকে

বাগানে ফুটেছে ফুল এই ভোরে বালিকা আসে নি
উহাদের পিতাদের নিয়েছে নগরী।

বাগানে ফুটেছে ফুল আকন্দ শেফালি
অধিকারী, অধিকারী, জানালায় তুমিই দিয়েছ
গোলাপ,

প্রভাত হতেই বৃষ্টি, বরুণের বারিধারা সিঞ্চনের।
দিন,

এই ভোর
ভোরের শেফালি, ভালবাসা কথন বিলাপ।

ব্যাস, ছাড়ো, কথা শেষ, এসে গেছে আমাদের
টোয়েন্টির টয়লেট গাড়ি।

এসে গেছে গাড়ি ?
: তুমিই নিয়েছ আলো, তুমিই নিয়েছ,
হ্যাঁ, তুমিই।

মঞ্জুভাষ মিত্র

সন্ধ্যাবেলার অসীম আঁধার

হে নীল স্রোতের মধ্যবর্তী অপরূপ বালিকা
তুমি ভয়াবহ। তুমি ভয়াবহ জলপ্রপাতের মত
সারারাত ধরে গর্জন করো আমার পায়ের নরম পাথর ছুঁয়ে
প্রাচীন স্তম্ভগাত্রে আমাকে দেখেছ
আত্মপ্রতিকৃতির বেদনা শেষ হয়ে গেলে রঙীন প্রদীপ নিভিয়ে ফুঁয়ে
ক্লান্ত প্রেমিক কবে চলে গেছে রাধা ও কৃষ্ণ মন্দির দ্বারপথে।
সন্ধ্যাবেলার আঁধারের স্রোতমালী
তোমরা আমাকে দংশন করো ধীরে ধীরে অতি ধীরে
আমার বুকের নিজস্ব সাপ যাতে জেগে ওঠে অতি সন্তর্পণে
'সঙ্গ' নামক নৌকা ভাসাব আঁধার জল।
হে নীলস্রোতের মধ্যবর্তী অপরূপ বালিকা
তুমি মায়াবিনী। তুমি মায়াবিনী শ্বেত ঝর্ণার মত
আমার পায়ের নরম পাথর দুইহাতে ঠেলে দাও
ওই চেয়ে দেখ তারা চলে যায় অসহায় একা পরিত্যক্ত পথচালকের মতো।
প্রেমিক-প্রেমিকা অঙ্কিত দ্বারপথে—
ভিক্ষা করছে ক্রীড়াসঙ্গিনী বেশ কিছুদিন থাকা যেতে পারে এ রকম এক
উষ্ণ-মধুর গৃহ
পথে যেতে তাকে দেখা গিয়েছিল আঙুরলতা ও আমরাবতী
কুন্দকুসুমে জ্যোৎস্নাভিসার : মাতালের হাসি শোনা যায়।
সন্ধ্যাবেলার অসীম আঁধার তুমি যন্ত্রণা তুমি যন্ত্রণা মরণস্রোতের মতো
সাপের মতন দংশন করো, নিঃসঙ্গতার বকুলমালা ও 'বিষাদ' নামক
নৌকা ভাসাবো জলে।

জয়ন্ত সান্যাল

নীল জ্যোৎস্নায় বিষণ্ণ স্মৃতি

দুঃখগুলি জড়ো করে কাঁপতে থাকে হাওয়া
ককিয়ে ওঠে আর্তশিশু, তার আঘাত
কখন স্পষ্ট হয়ে থমকে থামে অকস্মাৎ ;
আরে ? আমি পাইনি কিছু, এতদিনে হয়নি যাওয়া

মাঠ পেরিয়ে স্মৃতির কাছে যার দীঘল চোখে
নিবিড় মাথা ডান গালে তিল হলুদ শাড়ী
জলের ছায়ায় বিষণ্ণ সে, চাইলে শুধু পেতে পারি
অর্থবহ শব্দ কিছু অশ্রুনীর তার দুচোখে

মধুমাধবী ভট্টাচার্য

অন্যমনে কোথায় কখন

পা ঠেলে ঠেলে জলে কখনো বা বালিতে
চলতে থাকি, সঙ্গে এক আবছা স্বর
অবহেলিত বিষাদে।

সরে-যাওয়া জল ফেরে বার বার
সঙ্গে ছেঁড়া জাল, কাঠের টুকরো
বা মড়ার খুলি ঘিরে, কিছু কৌতূহল
আগাছার কাছাকাছি।

ফিরে আসে সব।
তবু দাঁড়াতে হয় একবার—
দেখি,
পিছনের সেই চেনা স্বর পায়ে পায়ে
বেঁধে নিয়ে গেছে আমার ঘরকে।

প্রত্যুম্ন মিত্র

প্রস্থান

রঙীন ছাতার নীচে হেঁটে গেলে তুমি
দূর থকে দীর্ঘতর হয়ে যায় সমস্ত ভাবনা
যেমন নিজের ছায়া অকস্মাৎ বেড়ে ওঠে কপিশ রোদ্দুরে।
কে বলবে তুমি ছিলে সেলায়ের ফ্রেমে
রিফুকাজে, যেমন শিল্পের কাছে নত হয়ে আসে দুঃখ
বালিয়াড়ি ভেঙে ফেলে চলে আসি তোমার প্রবাসে।
কোথায় দরোজা আছে খুলে দিলে অন্তহীন সিঁড়ি
সমস্ত মিনার রঙীন মিনার কাজে উল্লসিত
আলন্দ প্রকোষ্ঠ চূড়া তুচ্ছ করে নেমে যায় মধুর-কষায়ে,
কে বলবে তুমি ছিলে কোমরে জড়ানো শাড়ি,
রঙীন ছাতার নিচে হেঁটে যাও তুমি
উচ্চকিত কাঞ্চনের কাছে হেসে কথা বলো
হাড়কঙ্করের মতো মাজা মুখে,
আমরণ একটি পালঙ্ক থাক তোমাকে শোয়াতে
লেবুপল্লবের মত সুগন্ধি চুলের ঢলে নেমে গিয়ে
বিদ্যুতের মত খসে যেতে।

এখন তোমার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে
হাঁটুতে তামার বেড়ি উঠে আসে বাহুতে তাবিজ,
তার চেয়ে এই ভালো অমানুষ শুয়ে থাকা
তোমার গরদরঙা তনতনে শরীরের কাছে যেতে
পরিশ্রম বড়ো পরিশ্রম—
রঙীন ছায়ার নিচে হেঁটে যাও তুমি
কোল পেতে বসে আসে সব কবি হাঙর বা ফেউ ॥

স্বপ্না মজুমদার

ঘুড়ি ওড়াবে বলে

ঘুমের ভেতরে এমন প্রচণ্ড গোলমাল
সমস্ত যন্ত্রণা যেন একচক্ষু কাক হয়ে
ঝুল-পড়া অট্টালিকার কার্ণিশে দাঁড়িয়ে
দিনভোর ডেকে যায়।
হাত বাড়িয়ে ধরব—
নেই এমন শূন্যতারও সম্বল।

অথচ আশ্চর্য—
বুকের মধ্যে কে যেন
অবিরাম সুতোয় মাঞ্জা দিয়ে চলেছে
শরতের আকাশে ঘুড়ি ওড়াবে বলে ॥

ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য

মৃতদেহে মালা পরাবো বলে

দেখতে দেখতে তোমার দেহের সবটুকু মিলিয়ে গেল আগুনের মধ্যে
তোমার ছাইয়ের ওপর আমার চোখের জল
শ্রাবণের ধারার মতো পড়তে লাগল।
তুমি তো কত সহজে চলে গেলে ;
আশ্চর্য কি জানো, তোমার মৃতদেহে
মালা পরাব বলে আজ ফুল ফুটে ছিল।
তোমার জন্য সুগন্ধি কাঠও আনা হয়েছিল
তোমাকে ঘিরেই আজকের সন্ধ্যেটা।
আর কাল ভোরে ডোমেরা প্রস্তুত হবে কোন শিশুর জন্য।
সৃষ্টিকর্তার মত বড পাগল আর কেউ আছে—তুমি জানো ?

প্রদীপ রায়চৌধুরী

কবচকুণ্ডলে

কর্ণের ঔদ্ধত্যের ভ্রূণ ছিলো বুকের গোপনে, যেন অন্তর্বাস।
তোমার চোখের মতো পবিত্র সকাল,
পুলিশ ফাড়িতে থাকা ফরিয়াদী ট্যাক্সির অঙ্গ জুড়ে
ঘণ্টা প্রতি ছুটে চলার প্রতিশ্রুতি,
নিখুঁত ভাস্কর্যের মতো থমকে থাকে বিপন্ন গতির ঘড়িতে।
কুয়াসাচ্ছন্ন মন্দিরের অস্পষ্ট সোপানে আগ্রাসী অন্ধকারে
দীর্ঘ ছায়া ঢলে পড়ে,
নির্বিকারে নীচে নেমে যায়।

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক স্বরূপা ট্রেডিং, কলিকাতা ৫০-এ মুদ্রিত ও
উত্তরসূরি কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।